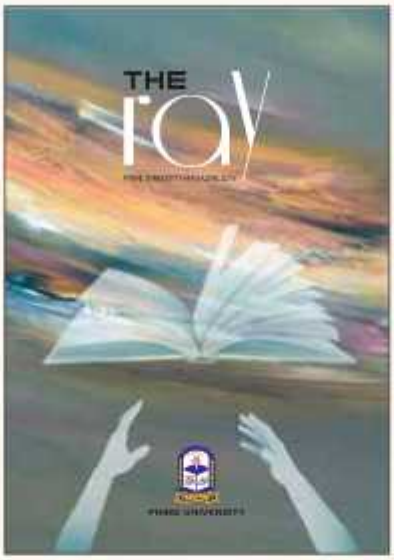

THE RAY

4th Issue 2019

Prime University
114/116, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka-1216

EDITORIAL BOARD

Advisory Board:

Mir Shahabuddin, Chairman, Board of Trustees
Md Ashraf Ali, Senior Vice Chairman, Board of Trustees
Prof Dr M Abdus Sobhan, Vice Chancellor
Prof Dr Mohammad Arshad Ali, Treasurer
Prof Dr Abu Saleh Abdun Noor, Dean, Faculty of Engineering

Editorial Board:

Chief Editor: Md Nur Hossain Talukder, Controller of Examinations
Co-Editors : Mahboob Ul Alam, Professor, Department of Education
Rakib Uddin, Assistant Professor, Department of English
Members : Muhammad Abul Hossain, Associate Prof, Department of Bangla
Md Abu Zaman, Associate Prof, Department of EEE
Nahid Farzana, Associate Prof, Department of Business Administration
Eman Hossain, Associate Prof, Department of Business Administration
Aysha Alam Talukder, Assistant Prof, Department of English
Md Ashrafuzzaman, Assistant Prof, Department of Education
Syed Mohammad Rezwanul Islam, Sr Lecturer, Department of Law
Shekh Md Nazmul Huda, Lecturer, Department of CSE
Alaul Alam, Lecturer, Prime University Language School
F Nahid Huq, Deputy Director, CRHP

Cover Design:
Sanjib Purohith

Published by:
Centre for Research, HRD and Publications
Prime University
114/116, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka-1216

CHAIRMAN
BOARD OF TRUSTEES

MESSAGE

I am very much delighted to see that the 4th issue of the Annual Magazine of Prime University - 'The Ray' is going to be published soon.

As the education is not merely confined inside books and overburdened with examinations, tutorials and all such serious matters but also demands exposure of the incumbent students in other co-curricular activities which include contribution in the yearly magazine also. Prime University believes such education that could be attained with great enthusiasm and agility through other activities. 'The Ray' assists the young learners to build their confidence, grow artistic self-expression, boosts up their imagination and empathy. 'The Ray' is the platform where the young learners get a chance to involve themselves in creative and critical thinking of writing.

I am very much proud to see the increasing involvement of the students' contribution in the magazine. I am also very happy to see the quality contribution of our students in the forthcoming publication of 'The Ray'. I hope that, the readers will enjoy this issue and students will be more and more encouraged to contribute contributions in future.

Finally, I extend my heartfelt thanks to the Editorial Board of the magazine and wish all the success of 'The Ray'.

Mir Shahabuddin

Mir Shahabuddin

VICE CHANCELLOR

MESSAGE

It gives me immense pleasure to write a few words on the gracious publication of the fourth issue of the annual magazine of Prime University, The Ray. It really pays me a massive gratification and I am thrilled to witness the fourth issue of the magazine The Ray.

The Ray is an enormous platform for the students, the teachers and the staffs of the university to bloom their creativity. The magazine started its royal journey in 2016 and successfully published its three gracious issues. The publications of The Ray have been highly praised by its readers in the different corners of the country and the recognized scholars immensely appreciated the efforts performed by the university.

To be frank, for the betterment of the students, Prime University is always a pioneer to initiate different co-curricular and extra-curricular activities. By initiating the activities of The Ray, the university has opened a magnificent field to cultivate creative knowledge to let the students, the teachers and the staffs be flourished in their own fields of creativity. By the grace of Almighty Allah, the fourth issue will also be a success and hold the appeal and enthrallment of its valued readers.

I wish every success of publication of the fourth issue of the annual magazine, The Ray.

Md Abdus Sobhan

Prof Dr M Abdus Sobhan

EDITORIAL

Prime University is going to unveil the forth issue-2019 of the annual magazine 'The Ray'. Meanwhile each issue of this magazine has created an enormous response among the readers and the appreciators, which encourages us to step in the excellence. Rich in the works of the faculties, executives and students, this magazine is being published annually. In every issue the most outstanding feature we provide the readers is to publish the writings of the renowned poets and writers in the country. Moreover we are publishing the creative writings of the novice writers that help open up a new horizon in their life. Frankly saying, our effort is to inspire our students to be enthusiastic readers, writers and above all a worthy generation fit to compete the world.

Whole heartedly I am very thankful to Mir Shahabuddin, Honorable Chairman of the Board of Trustees of Prime University for his significant supervision in performing such a great task and also show my gratitude to Prof Dr M Abdus Sobhan, Vice Chancellor of our university for his cordial support in this regard. To the last, I am extending my thanks to the concerned, who have had every endeavor to make the current issue an excellent one.

I believe, the forth issue of The Ray will have every attraction to fulfil the requirements of the readers of all walks.

M. H. Talukder.

Md Nur Hossain Talukder

CONTENTS

প্রবন্ধ

মোঃ আশরাফুজ্জামান :	বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন: দিক-নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৩
Alaul Alam :	Beliefs in Evil Eye	১৬
Muhammad Tanvir Ahmmed :	March 1971: Final Victory is Ours	১৮
প্রকৌশলী আলমগীর খোরশেদ :	তুমি আমি ও সে	২২
প্রদীপ কুমার দেবনাথ :	ইউসেপ বাংলাদেশ (সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা)	২৪
রোকেয়া জাহান :	প্যারাডাইজ আমার গর্ব, প্রাইম আমার প্রেরণা	২৫
জাকিয়া সুলতানা :	শিক্ষা সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা	২৬
সুইটি রিছিল বাইন :	বাস্তব জীবনে নৈতিকতা, মেধা তালিকার চেয়েও বেশি কার্যকর	২৮
রঞ্জিতা রাণী রায় :	শিষ্টাচার	৩০
মোঃ রাজিবুল হাসান :	আমার প্রিয় শিক্ষক	৩১
Adeba Nawshin Poonam :	Integrity is More Important than Achieving Degrees	৩২
Md Naser Uddin :	Racism in US	৩৩
তানিয়া তুষ্টি :	মুসলিম সাহিত্যের বিখ্যাত কবি	৩৫

গল্প

সেলিনা হোসেন :	বাড়ি ফেরা	৪০
মোঃ আজিজুল ইসলাম :	বিজয়িনী	৪৪
Azmain-ar-rafi (Omi) :	A Job Battle of Honesty	৪৭

কবিতা (ফিরে দেখা)

কালীপ্রসন্ন ঘোষ :	পারিব না	৫০
শামসুর রাহমান :	তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা	৫১

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণ	:	বিবাহ	৫৪
হাবীবুল্লাহ সিরাজী	:	আমার একাত্তর	৫৫
কামাল চৌধুরী	:	নাপিত সমাজ	৫৬
সৈয়দ শফিউল ইসলাম	:	হারিয়ে যাব	৫৭
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	:	ভাবনা	৫৮
মাহ্‌বুব উল আলম	:	ইচ্ছে করে	৬০
Mahboob Ul Alam	:	Silence Sometimes Speaks	৬২
মুহাম্মদ আবুল হোসেন	:	ছন্দে ছন্দে বর্ণবোধ	৬৩
জসীম খান	:	উত্তাল প্রেম যমুনা	৬৬
আলমগীর কবির	:	শেষের মিলন	৬৭
রেজিয়া খানম	:	অদম্য চাষবাস	৬৮
মোঃ নাজমুল হক	:	মানবতার ডাক	৬৯
মোঃ হাসিকুল আলম (আশিক)	:	একুশে ফেব্রুয়ারি	৭০
মোঃ শাকিল ইসলাম	:	শিক্ষক সে যে তুমিই	৭১
মোঃ আতাউর রহমান তুরাক	:	স্বাধীনতার ডাক	৭৩
তামান্না বিনতে জাহের	:	প্রাবিয়ান	৭৪
মোঃ খায়রুল ইসলাম	:	আলোর দিশারী	৭৫
মার্জিয়া আক্তার মণি	:	আমার তুমি	৭৬
Rabeya Khatun Bipa	:	A Villanelle Poem Gentle Breeze Blows before the Rain	৭৭
রুমা আক্তার	:	ভালোবাসা	৭৮
সুজানা সেতু	:	ইচ্ছে	৭৯
মিফতাহুল জান্নাত মিষ্টি	:	হাসিতে মৃত্যু	৮০
মোঃ সানোয়ার হাসান চৌধুরী (সজীব)	:	আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি	৮১
মোঃ ইসহাক তালুকদার	:	ভাষাপ্রীতি	৮৩
মোঃ রফিকুল ইসলাম	:	চিড়িয়াখানা	৮৫
মাহ্‌ফিয়া আক্তার মিতু	:	কিছু কথা	৮৭
তানজিনা নাজনীন	:	জীবনের শেষে	৮৮
Safia Shahrin	:	Love	৮৯
আবু হোসেন মোঃ ইখলাস	**ছড়া**	ছোট্ট খোকন	৯০

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত : চিকিৎসাসেবাই আমার প্রার্থনা ৯২
জসীম মাহমুদ : নস্টালজিক ৯৫
অন্তরা দাশগুপ্তা : আমার কর্মজীবন ৯৭

রম্য রচনা

মোঃ কামরুল হাসান : কৌতুক ৯৯

ভ্রমণ কাহিনী

মোঃ আব্দুল বাতেন : ভ্রমণ অভিজ্ঞতা: কলকাতা থেকে দার্জিলিং ১০১

সচেতনতামূলক রচনা

মোঃ শামসুল আকরাম (সুমন) : ফিশিং : সাইবার নিরাপত্তা ১০৩

Prime University in International Arena

AKM Saifulla : Participation in the 12th South Asian Universitie Festival (SAUFEST-2019) 106
Shuvodip Das : Participation in 'Bhutan International Education Fair -2019' 108
Nishat Ara Karim : Participation in 'International Education Fair -2019' 110

Photo Gallery 113

প্রবন্ধ

মোঃ আশরাফুজ্জামান	:	বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন: দিক-নির্দেশনা, বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা
Alaul Alam	:	Beliefs in Evil Eye
Muhammad Tanvir Ahmmed	:	March 1971: Final Victory is ours
আলমগীর খোরশেদ	:	তুমি আমি ও সে
প্রদীপ কুমার দেবনাথ	:	ইউসেপ বাংলাদেশ (সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা)
রোকেয়া জাহান	:	প্যারাডাইজ আমার গর্ব, প্রাইম আমার প্রেরণা
জাকিয়া সুলতানা	:	শিক্ষা সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা
সুইটি রিছিল বাইন	:	বাস্তব জীবনে নৈতিকতা, মেধা তালিকার চেয়েও বেশি কার্যকর
রঞ্জিতা রাণী রায়	:	শিষ্টাচার
মোঃ রাজিবুল হাসান	:	আমার প্রিয় শিক্ষক
Adeba Nawshin Poonam	:	Integrity is More Important than Achieving Degrees
Md Naser Uddin	:	Racism in US
তানিয়া তুষ্টি	:	মুসলিম সাহিত্যের বিখ্যাত কবি

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন: দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মো: আশরাফুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
শিক্ষা বিভাগ
ও
সহকারী প্রোক্টর

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

- শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, শিক্ষা ও শিক্ষার সকল স্তরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার দশ মাসের মাথায় জাতির জনকের প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের চারটি স্তম্ভমূলে বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার, আধুনিক ও কার্যকর সংবিধান রচিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু ১৪ ডিসেম্বর স্বাক্ষর করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। সংবিধানের সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১৭। রাষ্ট্র অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭২-১৯৭৬) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো হচ্ছে অবকাঠামো, পুনর্বাসন ও নির্মাণ, শিক্ষা, পরিকল্পিত

পরিবার সম্বলিত জনসংখ্যানীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আয় ও সুযোগ বৈষম্য হ্রাসকরণ। এরই ধারাবাহিকতায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন শুরু করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে বই, মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেখানে সরকারি কোষাগারে অর্থের ঘাটতি ছিল, বিদেশি সাহায্য ছিল অপর্যাপ্ত, সেখানে জাতীয়করণ পদক্ষেপ ছিল দুঃসাহসিক; অথব তিনি তা সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে যে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে। প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল বেশি। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করেছিলেন আড়াই কোটি টাকা। এছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি, যা ছিল নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করা হয়েছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যা মুক্তবুদ্ধির চর্চার পথকে সুগম করেছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদাকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেই কমিটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি জেনে এবং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষার বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং সুচিন্তিত মতামত নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে কমিশন ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের বেশির ভাগই প্রতিফলিত হয়েছিল। কমিশন শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তনসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। এই সুপারিশগুলো করা হয়েছিল জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে। এই কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু-সরকারও এই কমিশনের রিপোর্টকে সাদরে গ্রহণ করে, যার ফলে অনুমোদিত হয় একটি বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক, যুগোপযোগী একীভূত ধারার এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার বিধান সম্বলিত শিক্ষানীতি যা মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি, যার মাধ্যমে দক্ষভাবে বাস্তবায়িত হবে অর্থনীতি বিকাশের পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকার।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা অনুধাবন করে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্বের বিশালতা সম্পর্কে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন-

"I have not seen the Himalayas, but I have seen Sheikh Mujib. In personality and in courage, this man is the Himalayas. I have thus had the experience of witnessing the Himalayas".

-Fidel Castro in 1973.

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় সেনাসদস্য কর্তৃক শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। পরবর্তীতে শিক্ষাঙ্গনে শুরু হয় অরাজকতা ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা এবং পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস স্থান দেয়া হয়।

তবে আশার কথা, দীর্ঘদিনের এই অন্ধকার সময়ের অবসান ঘটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গঠনের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার শিক্ষা ভাবনা ও দর্শন উপলব্ধি করে এবং এ দেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন ও গুণগতমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে আরও ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটি মাইলফলক স্থাপন করেছেন।

২০১৪ সালে জাতিসংঘের মহাসচিবের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈশ্বিক উদ্যোগের 'গ্লোবাল ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ (জিইএফআই)' শীর্ষক আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, 'মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক' এবং বিশ্বনেতাদের প্রতি 'শান্তি ও অহিংসতার সংস্কৃতি' গড়ে তুলতে 'অস্ত্র নয়, শিক্ষায় বিনিয়োগ' করার আহবান জানান।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, বছরের প্রথম স্কুল দিবসে বিনামূল্যে বই, প্রাথমিকে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা না রাখা, সাক্ষরতার হার ৭২.৬ ভাগে উন্নীতকরণ, পাবলিকের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, সবশেষে শিক্ষকদের সঠিক মূল্যায়ন– এ সবই ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং সমৃদ্ধ ও কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের বাস্তবায়ন হচ্ছে তার সুযোগ্য কন্যার হাত ধরে। শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি এবং মানবতাবাদী ভাবনার মাধ্যমেই জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষানুরাগী, মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে।

সবশেষে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গুণগত ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশায় অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র:

১. শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

২. শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭), কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।

৩. ড. অজিত দাস (২০১৫), একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা, নবরাগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৪. বাহালুল মজনুন চুন্নু (২০১৭), শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী উদ্যোগ, দৈনিক ইত্তেফাক।

৫. সালমা আক্তার নিশু (২০১৭), বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার অবদান, ঢাকা নিউজ ২৪।

৬. মুজাম্মিল আলী (২০১৭), বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও আজকের প্রেক্ষিত, শিক্ষাবার্তা.কম।

৭. ইসমাত জাহান (২০১৬), শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান, শিক্ষাবার্তা.কম

৮. ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (২০১৫), শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু: বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দৈনিক ইত্তেফাক।

৯. বিমল রায় (২০১৬), বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রা, ভোরের কাগজ।

১০. আবুল কালাম আজাদ (২০১৭), বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা, সংবাদ প্রতিক্ষণ।

১১. নূহ-উল-আলম-লেনিন, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন, উত্তরণ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর মুখপত্র।

Beliefs in Evil Eye

Alaul Alam
Lecturer in English Language
Prime University Language School

Different communities maintain different beliefs and traditions that can be typed as folk beliefs or common beliefs, having no ground scientifically but are widely accepted as truth by most members of one of the communities. All these beliefs are being orally transmitted through the ages. For thousands of years the eye has been maintaining its steady hold on the human imagination and through the ages, the poets, artists and the writers have become fascinated to write about the beauty of the eye conveying a sign of positivity presented in an appreciable mood, on the other hand, instances have been observed that evil eye (Bad Nazar) is believed to be offensive. In this regard, Greek philosopher Plutarch gave a scientific explanation that the human eye had the power of releasing invisible rays of energy that were in some cases strong enough to kill children or small animals.

In fact, the evil eye is a curse believed to be cast by a wicked glare, given to a person when he/she remains unaware. The superstition of the evil eye is such a phenomenon that exists in every culture and community though there may have the differences in the cultures, it carries almost the same type of evil eye myth. History reports that the belief in the evil eye dated back almost 3000 years to ancient Greek and Rome. It was believed that evil eye could cause mental and physical illness and used to be considered as the largest threat to whom had been praised beyond what they really deserved. Besides, in every religion regarding the evil eye, there is a strong belief and so, people have been warned as we know in Shahih Muslim Book 26, the Prophet Muhammad (SM) warns about the dangers of the evil eye and says that one must take a bath in order to counteract the effects of the evil eye's power. There is a Hindu belief evolving in this connection that gods and goddesses punish those who are proud of their achievement and destroy them with the power of evil eye to restore them to the level of mere mortals.

Especially in the Indian sub-continent, people have the strong belief in the evil eye, though science has developed tremendously. It is believed that someone who is envious, jealous or covetous, he or she may be the person with evil eye. It can harm you, your children, your livestock or your fruit trees by looking at them with envy and praising them. Folklorist Alan Dundes in his edited volume 'The Evil Eye" states that the victim's good fortune , good health, or good looks provoke an attack by someone with the evil eye. Symptoms of illness caused by the evil eye include loss of appetite, excessive yawning, hiccups, vomiting and fever.

Since the ancient time babies and children have been found vulnerable and affected by the evil eye, in order to save them from the threat of evil eye, mother puts a big round black spot with kajol (lampblack) on the child's forehead. Moreover, a black string round the child's waist is believed to be effective against evil eye. A number of diseases like insomnia, fatigue, depression and diarrhea can be caused when people are affected with evil eye. In many places, people consider disease both a magical and a medical issue.

In addition, animals, objects and buildings may also be affected with evil eye. There is a belief that if evil eye is cast upon a vehicle, may break down irreparably and similarly, if a cow is affected with evil eye, its milk may dry up or a house so cursed may soon develop a leaky roof or an insect infestation. Just about anything that goes wrong may be blamed on the power of the evil eye.

People find different types of remedies to save themselves from the evil eye. Wearing amulets is believed to discourage the evil eye and sometimes people are found to wear the symbol like evil eye to counteract the image of the evil eye. Using the color blue can also be the effective protector that symbolizes heaven and godliness. Charms, potions and spells are frequently used by the people of different communities lest evil eye might harm them. Some go to witch doctors, psychics or other spiritual healers to remove the curse. Besides, pretty young women have a secret dot drawn in eyeliner behind their ears to protect against the evil eye. Though evil eye is considered as an ancient and discredited belief playing no role in our 21st-century world, still in the modern society we believe in evil eye, presented as something mystical, magical or beyond our explanation. In this connection, folklorist Dundes claims that, "we should keep in mind that the evil eye is not some old-fashioned superstitious belief of interest solely to antiquarians. The evil eye continues to be a powerful factor affecting the behavior of countless millions of people throughout the world."

March 1971: Final Victory Is Ours

Muhammad Tanvir Ahmmed
Lecturer
Prime University Language School

March has always played a remarkable role in the political destiny of Bangalee nation. Our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born on 17th of March, 1920. The historical Lahore Resolution (proposed Pakistan) was declared on 23rd of March, 1940. The grand speech of call for independence was delivered by Sheikh Mujibur Rahman on 7th March, 1971. And the long-cherished sun of independence finally rose on the 26th of March, 1971. So, Bangladesh, Bangabandhu and March have always remained inseparable in our glorious history. And the most valiant champion of this political timeline is none other than Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of nation of Bangladesh.

The postponement of the National Assembly promised to be held on 3rd March, 1971 by General Yahya Khan, in fact, set the East Pakistan on fire and thereby, obligated the people of this province to march towards a free nation. The fate of East Pakistan was instantly decided and the countdown for Bangladesh started alongside. Being seriously disappointed and furious with this whimsical suspension of parliamentary session of the National Assembly, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman relevantly guessed the conceptual death of military-led East Pakistan. Bangabandhu, this time, deliberately started parading towards putting this civil-military drama to an end.

The 2nd of March marked the first course of action of liberation war with the first flight of Bangladesh flag before the building of Arts Faculty of Dhaka University under the banner of Chatra Shangram Parishad. The 3rd of March is the day of a call for a non-violent, non-cooperation political assembly. In protest to the unfair postponement of the parliamentary session, a meeting was held at Paltan Play Ground, presided over by Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the majority party, where the red-green flag of independence was again formally

elevated and our solemn national anthem "Amar sonar bangla, ami tomay bhalobashi (My golden Bengal, I love thee), was sung live for the first time.

Robert Frost competently said, "Freedom lies in being bold." On March 3, General Yahya Khan proposed an assembly with all the political parties to be held on March 10 and Sheikh Mujibur Rahman, the elected leader of the majority party in the general election of 1970, boldly refused this proposal. Rather, Sheikh Mujibur Rahman, in objection, announced an assembly on 7th March in Race Course Ground along with the declaration of non-stop Hartal from 7.00 a.m to 2.oo p.m every day. The entire nation was then ready enough to follow the command of their beloved leader. Bangabandhu and Bangladesh, indeed, appeared to be the complementary to each other. The charge of East Pakistan was taken over by Sheikh Mujibur Rahman.

The 7th of March, the day of the classic speech of all time and the landmark for the glorious liberation war, sparked millions of Bangalee hearts. That speech was, in fact, the driving force of liberation war. The significance of this epic speech is that Bangabandhu delivered this at gunpoint. The Pakistani Army was deployed all around the Race Course Ground and army-helicopters were patrolling over that massive public gathering of near about 1 million people. Pakistani army was all set to take armed actions against any declaration of independence from the meeting. No leader except Sheikh Mujibur Rahman, ever in political history, delivered his speech at gunpoint. Bangabandhu was completely alert of the fact that a little unwariness would equally risk his life and the lives of 10 lakhs innocent people present in the Race Course Ground. Affronting death, this great leader of all time sharply proclaimed, "Struggle this time is for liberation; struggle this time is for independence." From this historical meeting, Mujib announced 4 preconditions for participating in the Assembly session:

1. Withdrawal of the martial law
2. Return of the troops back to their barracks
3. Power handed back to the elected people's representatives
4. Proper investigation into the killings of unarmed civilians

This man was adequately confident of his people and that is the reason he never cared the bloodeye of Pakistan army. It was not arms to threaten Sheikh Mujib down; rather it was his absolute love for mass people which always let him resist against any injustice to the Bangalees.

Conversely, defeated by Awami League in the general election of 1970,

Zulfikar Ali Bhutto, the chief of Pakistan People's Party (PPP) strongly persuaded General Yahya to favour him in this political negotiation. Politically ambitious Bhutto did not at all want to fall off from this power circle. So, on 21st, Bhutto, even being unwelcomed by Awami League, rushed to Dhaka for joining Mujib-Yahya talk to be an opportunist shareholder of power transfer. In point of fact, Yahya was just wasting time through this fake political dialogue. Conspiracy was going on well under way. General Yahya was taking hard preparation for a bursting military operation and thereby, started shipping heavy arms from West Pakistan.

Being an iconic political intellectual, Sheikh Mujibur Rahman always kept the door of discussion open. From 15th March, political bargain was ongoing with General Yahya. Bangabandhu realized that as soon as he quit the political dialogue, the Pakistani juntas would ambush against the common people immediately. So, he never stopped debating with the juntas. Though, later on, many blamed Sheikh Mujibur Rahman for this dillydallies of political discussion, it is not so difficult to understand now what he cared most are the millions of innocent Bangalee lives. He was well aware of the cruelty of Pakistani army and for this he always kept the channel of dialogue open to mitigate the crisis in a systematic approach. Undeniably, the entire East Pakistan started following the singular command of Bangabandhu. So, if he once ordered, the entire mass would jump into the war in no time. At this point, Sheikh Mujib ranks to a world-leader. His political prudence proves to be higher than any other contemporary leader of his time. So, he never quit discussion and laterally guided his people to take guerilla preparation. From the Six Points Movement, it was historically noticeable that Sheikh Mujibur Rahman had never left the path of methodical approach to mitigate political crises. He was an ingenious politician, not an anarchist. Fidel Castro, the supreme leader of the Cuban Communist Revolution, was surprised to know that a whole nation fought its liberation war on the title of Mujib who was not even at all present in the war-field in person. And that is exactly why he compared Bangabandhu with Himalayas. He is called a charismatic leader.

March 21 to 23, this political conciliation ended up reaching nowhere. Up to 22nd March, the disagreement regarding National Assembly between Awami League and Pakistan People's Party became widely apparent. On 23rd March, the centenary of the Lahore resolution of 1940 and the Pakistan Day, the whole East Pakistan witnessed a new Mujib. Perhaps, he sensed Yahya's brutal martial plan. On this Pakistan Day, Sheikh Mujibur Rahman headed towards the presi dent's house for a

fresh talk displaying Bangladesh flag on his vehicle. Flags of an emerging Bangladesh were seen hovering across Dhaka city except president's house and cantonment.

On 25th, tension grew among the leaders of Awami League. Though the previous day was all spent dealing issues regarding possible power transfer, the juntas and Bhutto did not seem satisfied and rumours of an impending army operation against the Bangalee Nationalist Movement Spread over Dhaka city. The leaders of Awami League were waiting for being confirmed about the news and sketching their strategies in case of a military strike. Till afternoon nothing happened. After the twilight, they came to know that President Yahya Khan and his team had secretly left Dhaka for Karachi. Right at that moment, Bangabandhu realized the dead end of time. So, Sheikh Mujibur Rahman, the elected leader of the majority party in Pakistan's national assembly and spokesman of the seventy five million Bangalees of East Pakistan, transmitted the following directives on air for the nation as well as for the outside world:

This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever they might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from Bangladesh. Final victory is ours.

তুমি আমি ও সে

প্রকৌশলী আলমগীর খোরশেদ
২৯ তম ব্যাচ, ইইই
আই. ডিঃ ১২১০৩০৩০১০৬২

যে মানুষটি কাছে আছে, সহানুভূতি, কেয়ারিং, ভালোবাসায়, আবেগ, মনের টানে সেই তো তুমি। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী সৃষ্টি কনটিনিউ থাকার জন্য। এটাকে জেন্ডার ভিত্তিক নিলে ফিলিংসটাও ভেরী করবে। তুমি মিলনের প্রতিক। কাছে আসার প্রতিশ্রুতি। তুমি এর মাঝে লুকিয়ে থাকে মিলন, স্বর্গীয় ভালোবাসা। এই যে নর এবং নারী, একজন অপরজনের প্রতি টান অনুভব করে, সেটা তাদের দ্বারা সৃষ্ট কোন কারিশমা নয়। এটা ঐশ্বরিক। যদিও সবাই এটাকে ন্যাচারাল বলে চালিয়ে দেয়। ন্যাচারালকে প্রশ্ন করলে বিজ্ঞান থমকে দাড়ায়। কোন উত্তর খুঁজে পায়না। সেঅতীতকে বহন করে। অনেক ভালোলাগার মানুষটি যখন হৃদয়ের সব বাঁধন কেটে চলে যায়, তখন তার কথা ভাবতে গেলে সাথে একটা নতুন করণীয় যুক্ত হয়। আর সেটা হলো দীর্ঘশ্বাস।

তুমি যখন দুরে থাকে, তখন সে হয়ে যায়। সে বলতে আবার তৃতীয় পক্ষ কাউকে বুঝাতে পারে। তুমি আমি'র মাঝখানে চোরকাঁটা হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে সে। দুজন দীর্ঘদিন এক ছাদের নীচে সহবস্থানে বোরিং ফিল হয়। এক গুয়েমি চলে আসে। যাপিত জীবনের চাওয়া পাওয়া, বাস্তবতা, সাধের সাথে সাধ্যের সিনক্রোনাইজ না হলেই শুরু হয় ছন্দপতন। মনে হয় পাশের মানুষটি আগের মতো নেই, বদলে গেছে। একটা একাকীত্ব বোধ আঁকড়ে ধরে। অবচেতন মন বার বার বলতে থাকে, আমি কি আমার কাঙ্খিত মানুষ পেয়েছি? নাকি এর চেয়ে আমার সেই ভালো ছিলো। তখনই অনেক আপন করে নেয়া তুমি'র মাঝে পরিবর্তন ধরা পড়ে। মন মরে যায়। উচাটন মন একটু শান্তি চায়। এই সুযোগটাই তৃতীয় পক্ষ মানে সে কাজে লাগায়। সন্তপর্ণে ঢুকে পড়ে তুমি আমিএর মাঝখানে। ঝড় উঠে অবিশ্বাসের, ফাটল দেখা দেয় এতো দিন তিল তিল করে গড়ে তোলা রিলেশানে।

আমি তুমি সে নিয়ে রচিত হয়েছে অজস্রসাহিত্য। কবিতা গান, গল্প, উপন্যাস সব জায়গায় তুমি আর সে বাস করে মনের অজান্তেই।

বাবা আদম, সৃষ্টির প্রথম মানব। আদম একা একা বেহেশতে ঘুরে বেড়ান। ফুল, ফল, পাখি, জল, ফোয়ারা তাঁর মনকে টানেনা। মনটা কেমন যেনো গুমড়া হয়ে থাকে। কি যেনো একটা অভাব বোধ কাজ করে মনে। নিজকে, মনকে, আত্মাকে, সুখী করতে একজন সাথীর প্রয়োজন বোধ করেন। নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব, তাঁকে পুড়ে মারে বিষন্নতার অনলে পুড়িয়ে। একজন সে অথবা তুমি যার একটা কোমল স্পর্শের জন্য, মন উচাটন হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তা, ভাবনা এবং বেশ সময় হাতে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা আদমের জন্য সাথী তৈরি করলেন।

তিনি বিবি হাওয়া। সৃষ্টির জন্যই মানুষ। নারীকে সন্তান ধারনের ক্ষমতা দেন। আর এই সৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য নর এবং নারীতে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে ভাগ করেছেন। নারীজলের মতো। যে পাত্রেই দেওয়া হোক, সেখানেই ফিট। জল পানে পিপাসা দুর হয়, শান্তির আধার, আবার সেই জলকে ফুটালে আর শান্তি দেয় না, পুড়িয়ে দিয়ে জ্বালা দেয়। নরনারী একজন আরেকজনের প্রতি টান, আকর্ষণ, পাওয়ার ব্যাকুলতা, এসব হালকা করে নেবার কোন অবকাশ নেই। এই টুকু যদি না থাকে, তবে সে মহামানব। নয়তো অসুস্থ।

মায়ের উদর থেকে কান্না দিয়ে বেরিয়ে আসে মানুষ। জন্মের শুরুই হয় কান্না আর চিৎকার দিয়ে। নিজের একাকীত্ব বোধ তাকে পেয়ে বসে। সাথী হিসাবে মাকে পায় তখন। মায়ের উদরে এতো দিন আরামে থেকে আয়েসী মনোভাব জন্ম নেয় মনে। ভাবে, এই বুঝি সব সুখ হারিয়ে গেলো। যখন একটু বুঝতে শিখে, খেয়াল করে সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত, আদর করছে, কোলে নিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে। আর একটু বড় হলে, মা-বাবা কে চিনতে পারে। ছেলেরা সেই শিশু থেকেই মায়ের প্রতি টানটা অনুভব করে বেশি। মায়ের বুকের দুধ যখন চুক চুক করে খায়, দেখা গেছে শিশুটি একটা খাচ্ছে, আর অন্যটাকে ধরে রেখেছে। নিপলে হাত দিয়ে অযথা নাড়ানাড়ি করছে। আর একটু বড় হয়, শৈশব কৈশোর পাড় হয়ে যৌবনে। বুঝতে শিখে জীবনকে। চাওয়া পাওয়াকে। সমাজ, ধর্ম, পারিপার্শ্বিকতা তখন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, তার কি করা যাবে না, অথবা কি করা যাবে। লাইফে কি যেনো নেই, কিসের একটা অভাব তাড়া করে বেড়ায় তাকে সর্বক্ষণ। একজন তুমি অথবা সে এর প্রয়োজন অনুভব করে। টিভি ই হোক বা রেডিওতে নাটকই হোক দুজন ছেলে মেয়ের কথা, আশা, ভালোবাসা দেখলে আগ্রহ অনুভব করে। ভালোলাগা, রোমান্সফিল করে। ছেলেটা স্বপ্ন দেখে, কাঁচের চুড়ি বা কাঁকন পড়া একটা হাতের। দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরবে, সামনে এসে দাড়াবে কোমল হাতের লম্বা ঘোমটা টানা একটা লজ্জা রাঙ্গা মুখ, যে কিনা চোখ তুলে তাকাতে ও শিখেনি। যেনো ফোটা একটা গোলাপ, ধরলেই পাপড়িগুলো ঝরে পড়বে। খাবার দেওয়া বা কোন কাজের সময় প্রিয় মানুষটির হাতের চুড়ির টুং টাং শব্দ পৃথিবীতে সব চেয়ে মধুর মনে হয়।

শিশুটি মেয়ে হলে ঝুঁকে বাবার দিকে। বাবা কে সে তার আইডল ভাবতে থাকে। বাবার আদলে মনের ভিতর একজন নর বা পুরুষের স্কেচ এঁকে নেয়। এখানে ও বিপরীত লিঙ্গ কাজ করে। ছেলে মেয়ের এই চুম্বকত্ব সৃষ্টির শুরুতেই। অতীত ইতিহাস স্টাডি করলে দেখা যায়, যতো লাভ স্টোরি, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, তা নর নারী বা বিপরীত লিঙ্গ অথবা অর্থের কারণে।

তুমি অথবা সে ছাড়া জীবন থেমে যেতো। চাকরি, ব্যবসা, রোজগারের যতো সোর্স আছে, সব কিছুর অবশেষ কিন্তু বিপরীত লিঙ্গ। একটা দু'রুমের বাসা, একটা দু'জনের খাট, আলমারি, আলনা, কম্বল, টিভি, তারপর ছোট্ট একটা চাঁদ মুখো বেবি, দুজনের মাঝখানে ঘুমাবে, ঘরময় দৌড়াবে, দুষ্টুমি করবে, এই স্বপ্নটাই বুকের ভিতর সবার প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তুমি অথবা সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যাপিত জীবন ধারায়। কখন কার মায়াজালে কে আটকে যায়, কেউ জানেনা। আমি সম্পর্কে বিশ্বাসী। মানুষের সব কিছু হারিয়ে যায়, ভুলে যায়, কিন্তু মন মন্দিরে যার নামটা খোদাই করে রাখা হয়, সে--ই সারা জীবন ভর আঁকড়ে ধরে রাখে। যদি বিরহ আসে, তখন তুমি অথবা সে এর স্মৃতি বুকে নিয়ে, ভালো থাকার অভিনয় করে যাওয়াই, জীবন যেনো। একজন তুমি অথবা সে, বেঁচে থাকুক সবার জীবনে দুঃখবোধ নিয়ে নয়, জেলাসী নিয়ে নয়, অনাবিল সুখ নিয়ে হৃদয় সৈকতে বাসা বাঁধুক কপোত কপোতী।

ইউসেপ বাংলাদেশ (সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা)

প্রদীপ কুমার দেবনাথ
৪৯ তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি:১৮৩০১০৩০১০০৩
বিভাগঃ শিক্ষা

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, অসহায়, মাতা-পিতাহীন হয়ে পড়ে। নিউজল্যান্ডের অধিবাসী লিন্ডসে এ্যালেন চেইনী বাংলাদেশে এসে এই হতদরিদ্র পথ শিশু, সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদেরকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার জন্য এবং বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করার, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের মানবিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য সাধারণ লেখাপড়ার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই একটি স্কুল থেকে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয় ৩২টি, টেকনিক্যাল স্কুল ১২টি, পলিটেকনিক্যাল ২টি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ খরচ বহন করা হয় বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায়।

বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করানোর পর তাদেরকে টেকনিক্যাল স্কুলে অথবা পলিটেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করানো হয়, সেখান থেকে পাশ করার পর জব প্লেসমেন্টের সহায়তায় তাদের বাংলাদেশে অথবা বিদেশে চাকুরীর ব্যাপারে সরাসরি সহায়তা করা হয় এবং সেই অসহায় ছেলে-মেয়েরা সুন্দর–সুখী সমৃদ্ধশালী সংসার, সমাজ ও দেশকে উন্নয়নের দিকে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলে অনেকগুলো ট্রেড আছে। প্রত্যেক ট্রেডে ২ জন শিক্ষক আছেন। তাঁরা প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের তাদের পরিকল্পিত লেসন প্ল্যানে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কোন শিক্ষার্থী যদি পর পর ২ দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তা হলে সি.এম. তাদের বাসায় গিয়ে ফলো-আপ করেন এবং সমস্যাগুলো সমাধান করে তাদেরকে স্কুলমুখী করে তোলেন। প্রতি বছর দুইবার প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট করেন। শিক্ষকদের যুগোপযোগী শিক্ষার ধারা বা গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য প্যাডাগোজী ট্রেনিং-এর আয়োজন করে থাকেন। যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে পারেনা, মাতৃ-পিতৃহারা, অসহায় এইসব পথ শিশুকে ১৯৭২ সাল থেকে সেবা দিয়ে আসছে যে প্রতিষ্ঠানে সে প্রতিষ্ঠানের আমি একজন শিক্ষক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি এবং আমি মনে করি যে আপনারা এই ধরনের ছেলে-মেয়েদের দেখা পেলে অবশ্যই সারা বাংলাদেশে বিভাগীয় শহরগুলোতে ইউসেপ বাংলাদেশের সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে দিলে গৃহহীন গৃহ পাবে, অসহায় সহায় পাবে, দুর্বল সবল হবে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যাদের তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। সাথে সাথে আমরা সুখী ও সমৃদ্ধশীল জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো।

ট্রেডগুলোর নাম:

এসি, উড ফার্নিচার, মোবাইল সার্ভিসিং, মেশিন মেন্টেইনেন্স, নেটিং, গার্মেন্টেস, ইলেক্ট্রনিক্স, কুকিং, ড্রাইভিং।

প্যারাডাইজ আমার গর্ব, প্রাইম আমার প্রেরণা

রোকেয়া জাহান
৪৯ তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৮৩০১০৩০১০২৪

আমি একজন শিক্ষক। আমি শুধু একজন শিক্ষক নই, আমি প্যারাডাইজ পরিবারের সদস্য। প্যারাডাইজ শব্দের অর্থ স্বর্গ। আমার কর্মস্থলের নাম প্যারাডাইজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এখানে আমি কর্মরত আছি ১ জুলাই ২০০৭ সাল থেকে। যেদিন আমি প্রথম স্কুলে যোগদান করি তখন আমার বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন পারভিন আক্তার ম্যাডাম। তিনি আমার কর্ম জীবনের বা শিক্ষকতা জীবনের প্রেরণা। তার কাছ থেকে আমি কাজ শিখেছি। তার কাছ থেকে শিখেছি একটা স্কুল কীভাবে পরিচালনা করতে হয়। কীভাবে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা বা কন্ট্রোল করতে হয়। অভিভাবকদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো কীভাবে তাৎক্ষণিক সমাধান করতে হয়।

প্রতিটি কাজ তার হাত ধরে শেখা। কিন্তু তার সাথে কাজ করেছি মাত্র ১ বছর ২ মাস। এই ১২ বছরের কর্ম-জীবনের প্রতিটি পথ মনে হয় তার মাধ্যমে তৈরি। তিনি অনেক বড়-মনের মানুষ ছিলেন। বৈবাহিক কারণে স্কুলের চাকরি ছাড়তে হয় তাকে। কিন্তু, আজও তিনি আমার প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

আমি যখন স্কুলে যোগদান করি তখন সব চেয়ে কনিষ্ঠ ছিলাম। তাই সবাই (শিক্ষকগণ) আমাকে "ছোট ম্যাডাম" বলে ডাকতেন। সেখান থেকে আমি এখন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি ২০১২ সাল থেকে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০ জন থেকে এখন ১২০০ জন হয়েছে। পিইসিতে ৫৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ জন GPA-5 (A+) সহ পাশ করেছে এবং বৃত্তি পেয়েছে তিনজন। ২ জন ট্যালেন্টপুলে, ১ জন সাধারণ গ্রেডে। এই প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষা দিচ্ছি। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যালয় ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে,আমি প্রাইম ইউনিভার্সিটি থেকে বিএড করছি, যা কিনা আমার জীবনের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন এনেছে। আর স্কুলের পরিবেশ উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। অনেক কিছু নতুন করে শিখছি, যা আমাকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করছে। এছাড়া, শিশু মনোবিজ্ঞান, পরিমাপ ও মূল্যায়ন, বিশেষ করে গাঠনিক বা চলমান মূল্যায়ন, শিক্ষকের দায়িত্ব, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জেনেছি, যা আমার কর্মজীবনের জন্য খুবই সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বোপরি বিদ্যালয়ের বিরাট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি প্রাইম ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, দক্ষতা ও মূল্যবোধ এবং সেই সাথে আমিও "পারভিন আক্তার ম্যাডাম" এক সাথে কাজ করবো সব সময়। সবশেষে বলতে চাই-

* প্যারাডাইজ স্কুল আমার গর্ব ও অহংকার।
* প্রাইম ইউনিভার্সিটি আমার অনুপ্রেরণা ও নবশিক্ষার ভিত্তি।
* পারভিন ম্যাডাম কর্মজীবনের পথ প্রদর্শক।

শিক্ষা সংক্রান্ত অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা

জাকিয়া সুলতানা
৪৯তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৮৩০১০৩০১০২৩

জীবনে চলার পথে সকলেরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। আমারও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তা হলো আমার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা। আমেরিকাতে আমি অনেক বছর ছিলাম, যা কিনা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমেরিকাতে থাকাকালীন সে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়েছি। প্রথমে আমি সে-দেশের সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

সমাজ হলো একটি দেশের মূল ভিত্তি। যাকে কেন্দ্র করে সে দেশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর প্রত্যেকটি সমাজেরই সুনির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম কানুন আছে। আর এই সমাজ থেকেই জনগণ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে, আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থায় অনেক কিছুই লক্ষণীয়। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে দেশের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণতন্ত্র এবং নারী স্বাধীনতা। সাধারণভাবে আইনের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার ও বাকস্বাধীনতা রয়েছে। এ দুটো বিষয়ের উপর তারা অনেক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ওদেশের একটা ভালো দিক হলো নারীদেরকে তারা অনেক সম্মান দিয়ে থাকে। আইনের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সবচেয়ে উপরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আমার এক বন্ধুর স্বামী তাকে বিভিন্ন ব্যাপারে খুব চাপের মধ্যে রাখতো। এতে আমার বন্ধুটি খুব মন খারাপ করে থাকতো। সে পেশায় নার্স। তার কাজের উপরও এর প্রতিক্রিয়া পড়তো। যাই হোক অনেক দিন পরে সেই বন্ধুটির সংগে হাসপাতালে দেখা। তাকে সেইদিন খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমি উৎফুল্লতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আমার স্বামীকে গতরাতে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এবং এখন সে জেলে আছে। এরপর বিচারের রায় হলে তাকে কিছুদিন জেলে থাকতে হবে। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, সুবিচারই হলো সেদেশের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাটাও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমেরিকাতে জুনিয়র এবং সিনিয়র হাইস্কুলে একটা ব্যবস্থা আছে। তা হলো প্রত্যেকটি স্কুলে একজন করে গাইডেন্স কাউন্সিলর আছেন, যারা ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করে থাকেন। এক্ষেত্রে ওনারা প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্ত্বা এবং মতামতকে শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকেন, যা কিনা সেদেশের সংস্কৃতির একটি অংশ। এই সমস্ত নীতিমালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে

আমাদের বাঙালিদের জন্য একটু অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কারণ আমাদের Parenting System থেকে ওদের Parenting System কিছুটা আলাদা ধরনের। ওদেশের অনেক সাংস্কৃতিক নিয়মনীতিগুলো স্বভাবতই Parents হিসাবে আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। যা কিনা ওদেশের Parents সহজেই মেনে নেয়। কারণ আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ওদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যাই হোক আমরা বাঙালি অথবা এশিয়ান Parents হিসাবে দুটো সংস্কৃতিকে ক্যালকুলেট এবং মডিফাই করে একটা সলুশন তৈরী করে সেই অনুযায়ী আমাদের বাচ্চাদের পরিচালিত করে থাকি। এরপরও কাউকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার হতে হয়। বিশেষ করে যারা সবকিছু অবজ্ঞা করে ওদেশের সংস্কৃতিটাকে পুরোপুরি ভাবে ফলো করেছে তাদের কেউ কেউ ব্যর্থ হয়েছে, মানে At the end of the day তারা 'না ঘরকা না ঘাটকা' এই সমস্যায় উপনীত হয়েছে।

যাইহোক ওখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক ভালো। যেমন-প্রত্যেকটি স্কুলেই বাচ্চাদের ক্লাসরুমগুলোতে ব্যবহার করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় কম্পিউটার আছে, যার ফলে ছোট থেকেই বাচ্চারা Computer Oriented হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের সুযোগ সুবিধা রয়েছে যা-কিনা আমাদের দেশে প্রায় অসম্ভব। তবুও আমাদের আধুনিক চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে আধুনিক প্রযুক্তিগত নীতিমালা ব্যবহার করে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে পারবো। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, আমেরিকাতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিক্ষককে শিক্ষার মান-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং তা বাধ্যতামূলক। অপরদিকে আমাদের দেশেও আমরা শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে পারবো। তাই পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের দেশের এই সমস্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাহায্যেই আমরা শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সুন্দর-শারীরিক এবং মানসিক দিক গঠন করতে পারবো, যা কিনা অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে। কারণ তারাই দেশের ভবিষ্যৎ।

বাস্তব জীবনে নৈতিকতা, মেধা তালিকার চেয়েও বেশি কার্যকর

সুইটি রিছিল বাইন
৪৯ তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৮৩০১০৩০১০১৩

২০১৬ সালের মে মাস, দু হাতে বাজারের ব্যাগ, রিকশা থেকে নেমেছি, ঘরের দিকে যাব। হঠাৎ, আমার সামনে বড় এক দেহধারি লোক পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। উঠে বলল, আন্টি আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি রোমারিও, আপনি অনেক যত্ন করতেন, আমার মা ছিল না বলে প্রতি শনিবার নৈতিক ক্লাসের দিনে আপনার স্নেহ ছিল আমার অনেক বড় পাওয়া। রোমারিও আরও বলল, 'আমি এখন ইউএসএ শিকাগো শহরে কাজ করি, মেধাগত ভাবে আমি অনেক বেশি দূর যেতে পারি নি, কিন্তু আপনার দেয়া নৈতিক শিক্ষাগুলো আমাকে এতদূর আসতে সাহায্য করেছে।

আমার বস আমাকে খুব ভালবাসে। আমি মিথ্যা বলি না, চা-কফি পান করি না, সিগারেট বা অন্য কোন নেশা পানিও খাই না। মেধা তালিকায় আমি শীর্ষে নই, কিন্তু নৈতিকতার জন্য, আমার ভালো ব্যবহারের জন্য সবাই আমাকে পছন্দ করে, অন্যদের চাইতে বেশি ভালবাসে। আমি দুই মাস ছুটি পেয়েছি, অন্যদের এতবড় ছুটি দেয় না, অথচ আমাকে দিয়েছে শুধুমাত্র আমার কাজ, আচরণ ও ব্যবহারে তারা সন্তুষ্ট বলে।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ৫-৭ মিনিট রোমারিও'র কথা শুনে খুব ভাল লাগলো। আমি ইউএসএ যখন যাই, ওদের শিকাগোতে যেন সাক্ষাৎ করি। গত ২১ বছর যাবৎ আমি নৈতিক শিক্ষক হিসেবে শুধু শনিবার এবং নির্দিষ্ট দিনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার আনন্দ, প্রাপ্তি অনেক, ঐ ছোট শিশুগুলো বড় হয়ে সমাজে অবদান রাখছে, ভবিষ্যতেও রাখবে। কর্মস্থলে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যদিও পরোক্ষভাবে শত শিক্ষকের নিয়োগ, মূল্যায়ন এবং নীতি নির্ধারক কিন্তু ক্লাসরুমে প্রত্যক্ষ শিক্ষকের ভূমিকা আমার নয়।

আজও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি সেই সব শিক্ষকদের, যাদের বর্তমান কালের মতো এত ডিগ্রি ছিল না, বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল না। অথচ ওনারা ওনাদের সাধ্য অনুসারে উজাড় করে শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে কিছু শিক্ষক ছিলেন, অংকে কেউ কম পেলে কিংবা না বুঝলে তাকে বলতেন "বাড়ি গিয়ে ঘি খাও, তোমাদের মাথায় কি গোবর আছে"? আরও নানাবিধ কটু

কথা বলতেন। এখনো অনেক শিক্ষক বেঁচে আছেন, ওনাদের দেখলে আমাদের অনেক বন্ধুরা সম্মানের চোখে দেখেন না, শুধুমাত্র তাদের আচরণ ভাল ছিল না বলে।

এখনো অনেক শিক্ষককে দেখি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ গড়ার কারিগররা নিজেদের পেশাকে সম্মান করেন না, নৈতিকতা রক্ষা করার পরিবর্তে শুধু ফাঁকি দিয়ে সময় কাটান। প্রাইভেট পড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে আমি বহু ঘটনার সাক্ষী, এ পেশায় সঞ্চয় অনেক না থাকলেও সত্যিকারের সৎ, নীতিবান, পথ প্রদর্শক শিক্ষকদের সবাই সম্মান প্রদর্শন করে। অনেক শিক্ষক আছেন যারা ছাত্রদের অসুস্থতায় বা প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করে দেন।

শিক্ষক সেমিনারে যোগ দিয়ে যে বিষয়টি তাদের স্মরণ করাতে আমি পছন্দ করি, তা হলো 'আপনার ক্লাস এর সব চাইতে দুর্বল ছাত্রটিও ভবিষ্যতে এমন কেউ হতে পারে, যার হাত থেকে আপনার অবসর ভাতা অথবা অবসর নিতে হতে পারে। তাই কাউকে অবহেলা বা দুর্বল বলে কটু ব্যবহার না করে, যতদূর সম্ভব সহায়তা করুন। আপনার শ্রম বৃথা যাবে না। স্রষ্টা আপনার মাধ্যমে সু-সমাজ গড়ার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা সত্যিই সম্মানীয় পেশা। এ-বিষয়ে আপনার সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করুন।

শিষ্টাচার

রঞ্জিতা রানী রায়
৫০ তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৯১০১০৩০১০০১

'শিষ্ট' অর্থ নম্র, 'আচার' অর্থ ব্যবহার। অর্থাৎ 'শিষ্টাচার' অর্থ নম্র ব্যবহার। একজন শিক্ষার্থীর শিষ্টাচার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক এবং এটি প্রথমে পরিবার থেকে শুরু, ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবার শুরুতেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে পরিবারেই নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেড়ে ওঠে। সর্বাগ্রে মা ও বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কারণ, মা-ই প্রথম শিশুকে বুঝতে পারে ও প্রথম শব্দটি মার কাছ থেকে শেখে। কবির ভাষায়-

> "মায়ের কাছে প্রথম শেখা বুলি
> সে যে হিরার কণাগুলি।"

এখানে বাবার ভূমিকাও কম নয়। মাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা থেকে শুরু করে, শিশুকে সময় দেয়া।

একটি শিশু বড় হয়ে যখন বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে বাবা মায়ের পরিবারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে আসে। নম্র ব্যবহারই পারে একজন শিক্ষার্থীকে তার উঁচু স্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে। নম্র ব্যবহার দিয়ে একজন শিক্ষার্থী সহপাঠী ও শিক্ষাগুরুর প্রতি স্নেহভাজন হয়ে উঠতে পারে। শিষ্টাচার একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক শিক্ষা যা জীবন গঠনে অতীব জরুরি। 'শিষ্টাচার' জীবনের সঙ্গে অঙ্গা-অঙ্গীভাবে জড়িত। একজন শিক্ষার্থী নম্র ব্যবহার বর্জিত জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র। সমষ্টিগতভাবে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একে অপরের পরিপূরক। সত্য কথা বলা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোট বড় মেনে চলা, প্রতিবেশীদের সংগে সৎব্যবহার করা, বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার ইত্যাদি একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ভাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে একজন শিশু জন্মায় না। সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে বড় হয়ে উঠলে জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায়।

আমার প্রিয় শিক্ষক

মোঃ রাজিবুল হাসান
৫০তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৯১০১০৩০১০০৪

পিতা মাতা ছাড়া যেমন সন্তান সম্ভব নয় তেমনি শিক্ষক ছাড়া ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশ হয় না। যে কোন জিনিস শিখতে বা জানতে গেলে ওস্তাদের প্রয়োজন হয়। আমি যার কাছ থেকে সামান্য কিছু শিখতে বা জানতে পারি সেই আমার ওস্তাদ বা শিক্ষক। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের কাছে সম্মানের। তার মধ্যে কিছু শিক্ষক অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন অনেক শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ শিক্ষক হয়ে ওঠেন। সে রকম আমারও প্রিয় শিক্ষক রয়েছে। একজন আদর্শ বা প্রিয় শিক্ষক এর গুণাবলী কেমন হওয়া দরকার?

- একজন শিক্ষক সকল ছাত্রছাত্রীদের যে কোন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় যে বিষয় আলোচনা করবেন তা যেন সকল শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- ছাত্রছাত্রীদের উপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবেন না।
- শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন।
- ভালোমন্দের বিচার বিবেচনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেন অবশ্যই বিদ্যমান থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- একজন প্রিয় শিক্ষকের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সবকিছুই শেয়ার করতে পারবে।
- একজন প্রিয় শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীর আইডল হবে, এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন।
- একজন আদর্শ শিক্ষকই পারেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতা ও বন্ধুসুলভ মনোভাব আনতে।
- শুধু ছাত্রছাত্রীদের প্রতি খেয়াল রাখলেই চলে না, শিক্ষকের তার নিজস্ব অনেক কাজ থাকে সেগুলোও সম্পূর্ণ করতে হবে যথাসময়ে।

সবার উপরে শিক্ষককে হতে হয় সৎ চরিত্রের অধিকারী।

Integrity Is More Important than Achieving Degrees

Adeba Nawshin Poonam
50th Batch, BA Hons in English
ID: 191010101042

No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are and how you treat people ultimately says that integrity is everything. Education is the key to success. Now tell me that through the word 'SUCCESS' what you really mean? If an educated person always tries to maltreat people with his knowledge, does it really mean success? Is fuel the only thing your car needs to get you in your destination? What's about the engine? If fuel is related to education to reach a goal, engine is the integrity which plays a vital role.

And lack of integrity our generation is emerging into the fake realities what we do not actually expect in the society. In most cases people are judged by the outfits and to them money is more important than family.

Today's education is just forcing students to focus on their studies and for this reason pupils are achieving degrees but lagging behind integrity.

However this integrity should be taught at the early stage of life, not in schools but in families.

During childhood our parents are our role model whatever they do, we tend to follow. Parenting is not just about caring for the physical growth of the child. It is every bit about the mental growth too. Parents arguably play the important role in the character formation of the child and have the most impact on how the child turns out to be in life as he grows up. May be people will involve in an argument that children learn their morals by their own or they learn from the schools. But to me it is false. Institutions can give students semblance only about the moral values but it is family where they can learn elaborately. So, it is the foremost duty of parents to teach their children integrity.

Integrity is more important than talent. People with talent may often succeed but without integrity they rarely stay in a position for a long time. The absence of integrity eventually topples them. Finally an educated person can be the backbone of a nation if and only if he is fully occupied with integrity.

Racism in US

Md Naser Uddin
50th Batch, MA in English
ID. 191010102001

The Former President of United States of America is dark skinned named Barak Obama and definitely his wife Michel Obama, the first lady of the United States is also a dark skinned woman. His Father was an African, a Muslim by faith and mother an American Christian. Most probably his father came from Kenya. By profession Obama is a lawyer. He was born in the United States. Due to his sky-hish popularity, he was selected as the candidate for the president ship from the Democratic party. The Democratic Party and the Republican Party in US have different goals and their symbols are ass and elephant.

Some necessary steps Barak Obama took for the development of humankind after bering elected as Us president are given below:

i. Climate change: On a conference with other nations Barak Obama discussed the issue of climate change with different Presidents and Prime Ministers of different countries of the world. They all decided to sign an agreement of banning the unusual products to maintain our environment neat and clean.

ii. Banning of delivering arms to the general people: To stop shooting in different educational institutions and religious institutions, Barak Obama wanted to stop the free access of guns specially to the general people and he also proposed to stop the business of guns though the opposite party and some members of the Congress were against in his speech because the United States mostly earn money from the arms business.

iii. Emphasizing on Israel and palestine Issue: Obama pressurized Israel not to invade Palestine. Besides, the administration of Barak Obama made peace-agreement between Iran and US so that Iran can sell their natural oil everywhere in the world. Though he could not support Brexit of UK, he remained silent on that issue because it was their internal affairs. This decision was controversial to Republican Party as well as to

his own Party. He also wanted to have a good relation between Cuba and US. However In his short period of time he could not fulfill his entire good wishes.

On the other hand, Donald Trump is a businessman. Once upon a time he was a commentator of WWF. At first, he rejected the agreement of climate change and arms controlling issues signed by Barak Obama though many western countries could not accept his wrong decision. A few days ago on the issue of shooting the Muslim in the mosque in New Zealand and grenade explosion in Srilanka he stated harshly against Muslims. Trump is a supporter of Israel and Russia. He declared Gaza will be capital city of Israel. Trump has shown a very cruel attitude on Iran Issue. Donald Trump also declares crusade in his speech. Thus predicated racism comes in the United States in the 21st Century.

মুসলিম সাহিত্যের বিখ্যাত কবি

তানিয়া তুষ্টি

শেখ ফয়জুল্লাহ:

শেখ ফয়জুল্লাহ মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। বিভিন্ন মতে, তার জন্মস্থান হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত, দক্ষিণ রাঢ় এবং কুমিল্লার নাম উল্লেখ ছিল। ১৫৫৯ থেকে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কররানী বংশের শাসনের অবসান ঘটেছে। ১৫৭৫ সালে বাংলায় শুরু হয় মুঘল আমল। এমন একটি সময়ে শেখ ফয়জুল্লাহ বেঁচে ছিলেন। শেখ ফয়জুল্লাহর সব মিলে পাঁচটি কাব্যের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো- 'গোরক্ষবিজয়', 'গাজীবিজয়', 'সত্যপীর' (১৫৭৫), 'জয়নবের চৌতিশা' এবং 'রাগনামা'। রংপুরের খোঁট দুয়ারের পীর ইসমাইল গাজীর জীবন নিয়ে রচিত গাজীবিজয় কাব্য। সত্যপীরের আধ্যাত্মিক সাধনা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে সত্যপীর কাব্যটি। জয়নবের চৌতিশার বিষয়বস্তু মহররমের মর্মান্তিক ঘটনা। রাগনামাকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সংগীতবিষয়ক কাব্য মনে করা হয়। দেখা যায় শেখ ফয়জুল্লাহর অধিকাংশ কাব্যের বিষয়ই পীর-দরবেশ এবং কারবালার মতো মুসলিম ঐতিহ্য। তবে গোরক্ষবিজয় কাব্য নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অথচ নাথসাহিত্য লিখেছিলেন শিবপন্থি নাথযোগীরা। এই নাথযোগীরা মধ্যযুগের বাংলায় দেহকেন্দ্রিক সুবিশাল এক ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। শেয় ফয়জুল্লাহ সমাজেসবচেয়ে বড় শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা হলো যা জানা ও বোঝার বিষয় তা কখনোই দ্বন্দ্বের বিষয় হতে পারে না। তিনি চিরায়ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

সৈয়দ সুলতান:

সৈয়দ সুলতান আনুমানিক ১৫৫০-১৬৮৪ সালের বাংলা সাহিত্যের কবি ছিলেন। তিনি হবিগঞ্জের সদর উপজেলার লস্করপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি সৈয়দ সুলতান কাহিনিকাব্য ও শাস্ত্রকাব্য রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। তার বাংলা ভাষার ওপর বিশেষ দখল ছিল। তিনি একাধারে ফার্সি ও উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা করেন। বাংলা ভাষায় রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা ও জয়কুম রাজার লড়াই। কবির সর্ববৃহৎ রচনা নবীবংশ। প্রায় ২৫ হাজার পঙক্তিতে নবীবংশ কাব্যটি রচনা করেন। তার শবে মেরাজ গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫০০ সালের শেষভাগ। নবীবংশ কাব্যের প্রথমে আল্লাহর গুনকীর্তন করে কবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মবৃত্তান্ত শুরু করার আগে ১৮ জন নবীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হজরত আদম (আ.)- এর কাহিনি প্রথম এবং

ঈসা (আ.)-এর কাহিনি দিয়ে নবীবংশ প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটান। এভাবে কবি এ মহাকাব্যের প্রথম খন্ডের সমাপ্তি টানেন। মহাকবি সৈয়দ সুলতান স্বসমাজে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবকে মনে-প্রাণে বরণ করে নিতে পারেননি। তাই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকভাবে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করেছিলেন। আর তাই সিলেট অঞ্চলের মুসলমানদের সাহিত্যিক রসপিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ' লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

শাহ মোহাম্মদ সগীর:

মুসলিম কবিদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর অন্যতম। আনুমানিক ১৩ থেকে ১৪ শতকের মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি প্রাচীনতম। ধারণা করা হয়, গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিস্টাব্দ) তার কাব্য 'ইউসুফ-জুলেখা' রচিত। শাহ মোহাম্মদ সগীর ছিলেন সুলতানের রাজকর্মচারী। তার লেখায় ধর্মীয় প্রেরণা লক্ষ্য করা যেত বেশি। বাংলা সাহিত্য মানবীয় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার পথিকৃৎ এই কবি। সে যুগে দেশি ভাষার রসনির্ভর ধর্মকাহিনি রচনা করার মধ্যে কবি সৎসাহসের পরিচয় দেন। ইউসুফ-জুলেখায় নবী হজরত ইউসুফ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনি ফিরদৌসী-জামির অনুসরণে কল্পিত হলেও তাতে বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তাকে তিনি বাংলায় একটি মৌলিক কাব্যের মর্যাদা দিয়ে গ্রন্থিত করেছেন। ড. এনামুল হকের মতে, কবি ইউসুফ-জুলেখার মূল কাহিনি সংগ্রহ করেন 'কিতাবুল কোরআন' থেকে। কিন্তু কাব্যটি ধর্মীয় উপাখ্যান নয়, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান যা মানবজীবন রসে সিক্ত। শাহ মোহাম্মদ সগীর মূলত কোরআনে বর্ণিত ইউসুফ-জুলেখাকে নতুন আকৃতিতে মোহনীয় মূর্তি গড়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় প্রণয়োপাখ্যানটি বোধগম্য করা এবং বাস্তবতা বর্জিত পুঁথিসাহিত্য থেকে পাঠককে প্রকৃত সাহিত্য রসে ফিরিয়ে আনা। শাহ মোহাম্মদ সগীর রসপ্রধান সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে যে যুগের উন্মোচন করেছেন পরবর্তীতে তা অনেকেই অনুকরণ করেন।

দোনাগাজী চৌধুরী:

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যকে যে কজন কবি সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম দোনাগাজী। তিনি বাংলায় 'আলিফ লায়লা' অবলম্বনে প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' রচনা করেন। তারপর মহাকবি আলাউল (১৫৯৭-১৬৭৩) ও মালে মুহম্মদ (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) একই কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। গবেষকরা মনে করেন, দোনাগাজী আনুমানিক ১৬ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৭ শতকের প্রথমভাগের কবি। নিজের লেখা কাব্যে, পুঁথিতে বা অন্য কেউ তার জন্মসাল উল্লেখ করেননি। গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দোনাগাজীর আবির্ভাব। দোনাগাজীর জন্মস্থান নিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রচলিত রয়েছে। কাব্যে তিনি জানিয়েছেন, 'দোল্লাই' দেশে তার নিবাস। দোল্লাই পরগনা বর্তমান কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। দোনাগাজীর 'চৌধুরী' উপাধি এবং কাব্যে ক্ষুরধার প্রতিভা দেখে আহমদ শরীফ অনুমান করেছেন, 'তিনি ধনী-মানী বংশের সন্তান। দেশে প্রচলিত বিদ্যা ও সংস্কৃতিতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।' দোনাগাজী রচিত 'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের শুরুতে কেবল স্তুতিপর্বে

আল্লাহ-রসুল-পীরের বন্দনা রয়েছে। কোনো রাজা, আমাত্য বা অন্য কারও প্রশংসা করা হয়নি। অর্থাৎ কোনে পৃষ্ঠপোষকতা কবি নেননি। হয়তো নিজে বিত্তবান হওয়ায় পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। এ থেকে অনুমান করা যায়, তার কাব্য রচনার

পেছনে আত্মোৎসাহ কাজ করেছে।

জেনুদ্দিন:

মধ্যযুগীয় অর্থাৎ ১৫ শতকের আরেক খ্যাতিমান কবি জৈনুদ্দিন। একটিমাত্র কাব্য 'রসুলবিজয়' রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যাঙ্গনে এখন পর্যন্ত প্রশংসনীয় হয়ে আছেন তিনি। শাহ মোহাম্মদ সগীর রসপ্রধান সাহিত্য যুগের উন্মোচন করলে তার অন্যতম অনুসারী হন জৈনুদ্দিন। তিনি গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহর (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) সভাকবি ছিলেন। সুলতান ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কবি ভণিতায় বার বার সুলতানের নাম উল্লেখ করেছেন। কবির বাবার নাম ছিল মৈনুদ্দিন।

তারা নিজেদের খলিফা আবুবকর সিদ্দিকীর বংশধর বলে দাবি করেন। জৈনুদ্দিন ছিলেন সুফি ধারার অনুসারী। শাহ মোহাম্মদ খান ছিলেন তার পীর। রসুলবিজয় যুদ্ধবিষয়ক একটি কাহিনিকাব্য। কাব্যটি হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইরাক অধিপতি জয়কুমের মধ্যকার দীর্ঘ যুদ্ধের বর্ণনা করে। যুদ্ধে ইসলামের বিজয় দেখানো হয়েছে। 'রসুলবিজয়'-এর গল্পাংশ কোনো ফার্সি পুস্তক থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপর কবি তাতে নতুন রূপ দিয়েছেন।

নসরুল্লাহ খাঁ:

মধ্যযুগের আরেক বাঙালি কবি ছিলেন নসরুল্লাহ খাঁ। আনুমানিক ১৫৬০-১৬২৫ সালে তিনি অসামান্য কিছু কাব্য রচনা করেন। এ পর্যন্ত তার রচিত চারটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো-জঙ্গনামা, মুসার সাওয়াল, শরিয়তনামা ও হিদায়িতুল ইসলাম। তার রচিত জঙ্গনামা ও শরিয়তনামা গ্রন্থে নিজের সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী দেখা যায়। শরিয়তনামায় লিখিত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, কবির পূর্ব পুরুষ হামিদুদ্দিন খান গৌড় দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। আধুনিক দক্ষিণ চট্টগ্রামের 'বাহার ছড়া' নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। কবি নসরুল্লাহর কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তার ভাইসহ বংশের অন্যরা এখনো বাঁশখালী থানার জলদি গ্রামে বসতি স্থাপন করে আছেন। বংশতালিকা থেকে জানা যায়, কবি ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। ১৬০০ সালের পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম সাহিত্যে একটি স্বর্ণযুগ দেখা যায়। সেই যুগের কবি ছিলেন তিনি।

দৌলত উজির বাহরাম খান:

আনুমানিক ১৬ শতকের বাংলা কবি দৌলত উজির বাহরাম খান। তার প্রকৃত নাম ছিল আসাউদ্দিন। চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ অথবা জাফরাবাদে গুণী এই কবির জন্ম। বাবা মোবারক খান ছিলেন চট্টলাধিপতির উজির (মন্ত্রী)। অল্প বয়সে বাবাকে হারালে চট্টগ্রামের অধিপতি নেজাম শূর বাবার উজির পদে তাকে অভিষিক্ত করেন। রাজকাজের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যাঙ্গনে রেখেছেন দৃপ্ত পদচারণা। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তবে তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। কবি আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আর তারই প্রমাণ মিলেছে দৌলত উজির বাহরাম

খান রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো থেকে। 'লাইলী মজনু' তার রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। কাব্য ধারায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে এটি স্থান পেয়েছে। এখন পর্যন্ত

সাহিত্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এই কাব্য। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে কবি লাইলী-মজনু কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লাইলী-মজনু কাব্য ফার্সি কবি জামিরের লাইলী-মজনু নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লাইলী-মজনু প্রেমকাহিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এই কাহিনির মূল উৎস আরবি লোকগাথা। কাহিনীটিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বিবেচনা করা হয়। আমির-পুত্র কায়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লাইলীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হন। লাইলীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে বাধা। ফলে মজনু পাগল হয়ে বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অন্যদিকে লাইলীর অন্যখানে বিয়ে হলেও তার মন থেকে যায় মজনুর কাছে। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনি অবলম্বনে লাইলী-মজনু কাব্য রচিত। ভারতের আমীর খসরু ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে, পারস্যের আব্দুর রহমান জামির ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে এবং আব্দুল্লাহ হাতিভি ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় এ কাব্য রচনা করেন। বাহরাম খান তাদের কোনো একজনের কাব্য অনুসরণ করেছিলেন। লাইলী-মজনু মূলত আধ্যাত্মিক কাব্য, কিন্তু বাংলা অনুবাদে তা পরিণত হয়েছে মানবিক প্রেমকাব্যে। বাহরাম খানই প্রথম এমন বিশ্বখ্যাত বিরহমূলক প্রেমকাহিনি নিয়ে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। বাহরাম খানের অপর আখ্যানকাব্য ইমাম-বিজয়। ইমাম-বিজয়ের বিষয়বস্তু কারবালার বিষাদময় যুদ্ধকাহিনি। সাহিত্যে দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত প্রথম কাব্যের নাম জঙ্গরনামা বা মক্তুল হোসেনও জনপ্রিয়। লাইলী-মজনু তার দ্বিতীয় কাব্য।

গল্প

সেলিনা হোসেন	:	বাড়ি ফেরা
মোঃ আজিজুল ইসলাম	:	বিজয়িনী
Azmain-ar-rafi (Omi)	:	A job battle of honesty

বাড়ি ফেরা

সেলিনা হোসেন

পায়ের ঘা শুকোয় না কেন, এ নিয়ে আছিরুদ্দীন তেমন চিন্তিত নয়। ও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ, পায়ের ঘা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় কোথায়? ভেবেছে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। ছোটখাটো এমন কত কিছুই তো হয়। কিন্তু না, দিন গড়ায় কিন্তু ঘা শুকোয় না। একদিন আছিরুদ্দীন জায়গাটা চেপেচুপে দেখে ভড়কে যায়। বেশ টুপটুপে হয়েছে। রস ঝরছে। হঠাৎ মনে হয় ছোট্ট একটা পোকার মতো কিছু একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আছিরুদ্দীনের বুক শুকিয়ে যায়। এ বড় অন্যায়। খেটে খাওয়া মানুষ বলে ঘায়ে পোকা হয়ে যেতে হবে? ও বাড়ির কাউকে কিছু বলে না।

কিন্তু বাদ সাধল বড় মেয়ে মেঘলা। আঠারো বছর বয়স। ব্র্যাকের স্কুলে পড়ে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আছিরুদ্দীনের ধারণা, এই পড়ালেখার ফলে মেয়েটির যথেষ্ট জ্ঞানগম্যি হয়েছে। ও সরাসরি বলে, আব্বা এটা খুব খারাপ অসুখ।

তুই ক্যামনে জানলি, মাগো?
এইটা তো সোজা হিসাব, আব্বা। ঘা শুকায়ে ভালো হবে। যখন শুকাবে না তখন বুঝতে হবে খারাপ। এটা হলো গিয়ে আক্কেল।

সাবাস, লেখাপড়া দিয়ে আক্কেলই তো চেয়েছিলাম। বুঝলি মা, আক্কেলটাই হলো বড় শিক্ষা। আমারও ইচ্ছা হয় তোর সঙ্গে স্কুলে যাই।

মেঘলা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্কুলে পড়ার গৌরব তার দৃষ্টিতে। কর্তৃত্বের সুরে বলে, স্কুলে পড়েই তো জানতে পারলাম ডায়রিয়া হলে কী করতে হবে। খোলা জায়গায় পায়খানা করলে কী হয়, পরিবেশ, পুষ্টি...

পাশ থেকে ওর মা বলে, হয়েছে থাম। গরিবের আবার এত কিছু। গরিবের ক্যাবল আক্কল থাকলেই হয়। তারপর স্বামীর দিকে ঘুরে বলে, ঘা থেকে গোন্ধ আসে।

পরদিন থানা সদর হাসপাতালে গেল আছিরুদ্দীন। সঙ্গে মেঘলা। দেখেশুনে ডাক্তার বলল, মনে হচ্ছে ডায়াবেটিস আছে। এতদিন অবহেলা করা উচিত হয়নি। তোমাকে ঢাকা যেতে হবে। পা-টা কেটে ফেলতেও হতে পারে।

ও বাবা গো! কি বলেন ডাক্তার সাহেব?

মেঘলা চেঁচামেচি করে।
আছিরুদ্দীন কাঁদে না, ভেঙেও পড়ে না, নির্বিকার কণ্ঠে বলে, আমাগো টাকা কনে যে ঢাকা যাব?

টাকা না থাকলে, পাও থাকে না। যাও, বাড়ি যাও।

ডাক্তার অন্য রোগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। মেঘলা একবার ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়, একবার হাতে ধরা প্রেসক্রিপশন দেখে। ডাক্তারের হাতের লেখা ও পড়তে পারে না। ইংরেজিতে লেখা ওষুধের নাম ও পড়তে পারবে এতটা শিক্ষা ও পায়নি। নিজের ওপর রেগে গিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার সাহেব ওষুধ কি হাসপাতালে আছে?

না। বাইরে থেকে কিনতে হবে।
ডাক্তারের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

আছিরুদ্দীন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার মুখে কথা নেই। যা কথা মেঘলাই বলছে। ওর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে মেঘলাই বড়। চটপটে। আছিরুদ্দীনের ভাষায়, ভীষণ বুদ্ধি মেয়েটির। তারপর বড় করে শ্বাস টেনে বলে, মেয়েটা যদি আমার ছেলে হতো!

এ দীর্ঘশ্বাসের জবাব হয় না। মেঘলা এমন কথা শুনে আড়ালে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, ছেলে হলে আপনের মুন্ডুপাত করত। বাবাকে ও ভীষণ ভালোবাসে। তবে দুঃখে আঘাত দিতে চায় না। মায়ের ধারণা, মেয়ে হওয়াটা মস্ত অপরাধ। মেয়েদের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়। মেঘলা মায়ের কথা শুনেও দাঁত কিড়মিড় করে বলে, আম্মা মনে হয় আপনে বিয়ের পর মেয়ে হয়েছেন। আপনের আব্বার কোনো ভাবনা ছিল না।

আছিরুদ্দীন মেয়ের জবাব শুনে হো হো করে হাসে। ওর মা রেগে তীব্র চোখে তাকায়।

মেঘলা তখনো ডাক্তারের টেবিলের সামনে থেকে নড়েনি। জিজ্ঞেস করে, এ ওষুধগুলো খাওয়া হলে আবার আপনার এখানে আসব, ডাক্তার সাহেব?

না। বাড টেস্ট করাতে হবে। এখানে প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট নেই।

দুজন বাইরে আসে। ডাক্তারের জন্য একবেলা অপেক্ষা করতে হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, মর্জিমতো আসে আর যায়। তবু কপাল ভালো যে একবেলা বসে থেকে ডাক্তারের দেখা পেয়েছে। গাঁয়ে ফেরার বাস বিকেল পাঁচটায়। এখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি। আছিরুদ্দীন ক্লান্ত। খিদে পেয়েছে। মেঘলা মুড়ি কিনতে গেছে। আছিরুদ্দীনের বিমূঢ় ভাব কাটে না। ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। ও কী করে জানবে যে ওটা একটা ব্যাকহোল, বেরুনোর সাধ্যি আর নেই।

মেঘলা মুড়ি নিয়ে এসে ডাকে, আব্বা?
আছিরুদ্দীন বলে, ব্যাঁ, ব্যাঁ।
মেঘলা আবার ডাকে, আব্বা?
আছিরুদ্দীনের শব্দ, হাম্বা, হাম্বা...।
মেঘলা তৃতীয়বার ডাকে, আব্বা? ও আব্বা?
ঘেউ ঘেউ।
আব্বা গো?

মিউ, মিউ।
মেঘলা বুঝে যায় যে আব্বা আর মানুষ নেই। গরিব মানুষের এত বড় কিছু হলে সে মানুষের আকৃতি হারিয়ে ফেলে। তার ভেতরের মানসিক বোধও থেঁতলে যায়। তখন সে ভেতরে এবং বাইরে বিভিন্ন আকার পায়। সেটা এতই অদৃশ্য যে, তা দেখার জন্য বিশেষ চোখ লাগে। সবাই দেখতে পায় না। এই মুহূর্তে মেঘলা দেখতে পাচ্ছে। ওর বোধটি ভীষণ তীক্ষ্ণ। তাই ও বাবার ওপর রেগে যায়। মুড়ির ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, খান, মুড়ি খান।

আছিরুদ্দীন এক মুঠি মুড়ি গালে পোরে। মুড়ি খাওয়া শেষ করে দুজনে টিউবওয়েল চেপে পানি খেয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসে। কখন বাস আসবে কে জানে, জায়গাটা প্রায় ফাঁকা। চারটে ছেলে রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে গুলতানি মারছে। ওরা বড় একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। আছিরুদ্দীন মেয়ের কাঁধের ওপর হাত রাখে। চারদিকে ধুলোর আস্তর। গাছের পাতাগুলোর সবুজ বর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ মেঘলা বাবাকে ধরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেয়, চলেন ওই ডাক্তারের মাথা ভাঙি।

আছিরুদ্দীন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে বলে, ক্যান?

সরকার আমাদের জন্য ওষুধ দেয়। শুয়োরের বাচ্চা ওগুলো বেচে।
বেচবেই তো। ওদের যে অনেক দরকার।
আছিরুদ্দীনের পা টনটন করে। মনে হয় ঢাকা পর্যন্ত ওর আর যাওয়া হবে না। এই মেয়েটির ওপর সংসার রেখে মরতে হবে। মেয়েটি কীভাবে সংসার চালাবে? আছিরুদ্দীন আবার বিভিন্ন আকারে নিজের ভেতর প্রবেশ করতে থাকে। এখন আল্লাহ্ ছাড়া ওর আর কোনো ভরসা নেই। ওর জড়-জগৎ নিয়ন্ত্রণ করবেন রাব্বুল আলামিন।

মেঘলা নিজের ক্রোধ সামলে নিয়ে বলে, আব্বা আমাদের কী হবে?
শোকর কর মা। শোকর আলহামদুলিল্লাহ।
কিসের জন্য শোকর? আমরা কী পেলাম?
আমরা তো বেঁচে আছি মা।
কচু। বিষ খাওয়ার সময় হয়েছে।
তাও বল মা, শোকর আলহামদুলিল্লাহ ।

আছিরুদ্দীনের শোকর গোজারি শেষ হতে না হতেই সেই চারটি ছেলে গুলতানি ছেড়ে রাস্তার এপারে এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। আছিরুদ্দীন শক্ত করে মেঘলার হাত চেপে ধরে।

প্রথম ছেলেটি এক ঝটকায় আছিরুদ্দীনের হাতে টান দেয়, ছাড়, শুয়োরের বাচ্চা।
আপনারা কী চান?

চাই তোর মাইয়া। এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি। এক পা লড়বি তো জান খতম করে ফেলব।
চারজনে মেঘলাকে টানতে টানতে ইটখোলার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। মেঘলা চেঁচিয়ে বলে, আব্বা বলেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ ।
চারটি ছেলে হো হো করে হাসে। উচ্চহাসির রোলে চাপা পড়ে যায় মেঘলার চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একজন পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর মুখ বেঁধে দেয়। ও একজনের হাত কামড়ে দেয়, অন্যজনের মুখ খামচিয়ে রক্ত বের করে ফেলে। ওইটুকুই। ব্যস, মেঘলার যুদ্ধ শেষ। ইটখোলার ইটের পাজার আড়ালে ওরা ওরই শাড়ি দিয়ে ইটের সঙ্গে ওর দু'হাত বেঁধে রাখে।

তারপর একে একে... কতবার... মেঘলা মনে করতে পারে না। ও জ্ঞান হারায়।

কতকাল পর আছিরুদ্দীন দেখতে পায় বাস এসেছে। দুচার জন যাত্রী নেমে যে যার পথে চলে যায়, আছিরুদ্দীন নড়ে না। চড়ে না। গোঙায় না। বসে থাকে। বসে না থেকে উপায় নেই। মৃত্যু ভয় নয়, ধর্ষণের দৃশ্যটি দেখার গুনাহ্ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ও ছেলেগুলোর সামনে যেতে চায় না। এই মুহূর্তে এই গাছের গুঁড়িটি ওর সহায়। এখানে হেলান দিয়ে ও নিজেকে ধরে রাখতে পারছে।

কত রাত কে জানে, ছেলেগুলো চলে যায়। যাওয়ার সময় একজন ওর গায়ে লাথি দিয়ে বলে, মাইয়া লইয়া বাড়ি যা। আছিরুদ্দীন জানে, এই পথে আর কোনো বাস আসবে না। ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অন্ধকার হাতড়ে ইটখোলায় এসে পৌছে। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মেঘলা নিশ্চুপ বসে আছে। অন্ধকারে ওকে স্পষ্ট দেখা যায় না। এজন্য আছিরুদ্দীন আলাহর কাছে শোকরগোজারি করে। তারপর মেয়েকে ডাকে, মা?

ব্যাঁ, ব্যাঁ।
মারে
হাম্বা, হাম্বা।
মাগো।
ঘেউ ঘেউ।
আছিরুদ্দীন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

মেঘলা ধমক দেয়, কাঁদেন ক্যান? চুপ করেন। কন শোকর আলহামদুলিল্লাহ ।

আছিরুদ্দীন থামতে পারে না, বরং চরাচর ফাঁটিয়ে চিৎকার করে ওঠে। মেঘলা নিঃশব্দে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা ইটগুলো সমান করে বিছায়। বাপের গায়ের চাদরটা ইটের ওপর পেতে দিয়ে বলে, ঘুমান আব্বা।

আছিরুদ্দীন শুয়ে পড়ে। মেঘলা বসে থাকে। প্রচন্ড যন্ত্রণা শরীরে। আজ রাতে ওর আর ঘুম আসবে না। ও একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাওয়ার সময় একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলেছে, রাতে তো তোর গাঁয়ে ফেরা হবে না। ভোর রাতে আবার আসব। এখন ঘুমোতে যাচ্ছি। এখানেই থাকিস।

মেঘলার এখন ভোর রাতের অপেক্ষা।

ভোররাতের আধো অন্ধকারে ছেলেটি আসে। ঘুম জড়ানো চোখ। গুলতানি মারার ভঙ্গিতে মেঘলার কাছে বসে ওর গায়ে হাত দেওয়ার আগেই পাশে জড়ো করে রাখা ইট দিয়ে ছেলেটির মাথায় বাড়ি মারে। ছেলেটির মাথা ফাঁক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। ও টুকরো-টাকরা ইটের ফাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ঘুম ভেঙে যায় আছিরুদ্দীনের। ধড়মড় করে উঠে বসে বেকুবের মতো বলে, কী করলি মা?

ও বাপের হাত ধরে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে, বাড়ি চলেন। বাস আসার সময় হয়েছে।

বিজয়িনী

মোঃ আজিজুল ইসলাম
ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান

লেখাপড়ায় তুখোড় মেধাবী ছবি ছোটবেলা থেকে বৈমানিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে সে তার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যেতে থাকে এবং নিজেকে যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলে। অবশেষে সে এবার নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার বৈমানিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করল। এক বছর হাড়ভাঙ্গা ট্রেনিং শেষ করে সে আজ বিমান চালানোর অনুমতি পেল। উচ্ছল ছবি দিনে দিনে তার বুদ্ধিমত্তা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার কলিগদের মাঝে নিজের একটা জায়গা করে নিতে থাকল। কাজের ফাঁকে একটু আড্ডা, দুষ্টুমি এভাবে তার দিন ভালই কাটছিল।

এদিকে চাকরিতে বছর পেরতে না পেরতে বৃদ্ধা মায়ের চাপে এক সময়ের খেলার সাথী খালাতো ভাই সহকারী প্রফেসর মামুনের সাথে তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চাকরি এবং সংসার দুটোই সমানতালে সে সামলাতে লাগল। আর মামুনও ছবিকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

বিয়ের দুই বছর পরে মামুন ও ছবির ঘর আলো করে এক পুত্র-সন্তান আসে। সবকিছু মিলে আজ যেন ছবির সংসার পূর্ণতা পেল। ছবি ও মামুন ভালোবেসে সন্তানের নাম রাখে স্বপ্ন। স্বপ্ন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নের বয়স যখন দেড় বছর, ছবি তার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে। বিষয়টা মামুনকে জানালে, মামুন হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু ছবির মনের শঙ্কা দূর হয় না। কারণ স্বপ্ন সহজে কাউকে রেসপন্স করে না, একা একা কথা বলে, সারাক্ষণ অস্থির থাকে; চিৎকার-চেঁচামেচি করতে থাকে, কারও কোনো কথা শোনে না, হাতের কাছে যা পায় সবকিছু ভেঙ্গে ফেলে। ছবি সারারাত জেগে স্বপ্নের সাথে খেলা করে। দিনদিন বিশ্রামহীন ছবির স্বাস্থ্যও ভাঙতে থাকে, কিন্তু সে তো হাল ছাড়া মানুষ নয় !

মামুন এবং ছবি তাদের একমাত্র সন্তান স্বপ্নকে নিয়ে দেশের নামকরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ডাক্তার স্বপ্নকে বিশেষ-শিশু (অটিস্টিক চাইল্ড) হিসাবে চিহ্নিত করে এবং জানিয়ে দেয়, সে কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হবে না। ছবি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু হতাশ হয় না।

স্বপ্নের অসুস্থতার জন্য ছবি অনেক ভেবে-চিন্তে মামুনের নিষেধ উপেক্ষা করে তার শখের এবং সারাজীবনের আকাংক্ষিত চাকরিটা ছেড়ে দেয়। স্বপ্নকে যে-কোনো মূল্যে সুস্থ করাই এখন তার একমাত্র ব্রত।

ছবি তার সন্তানের সুস্থতার আশা ছাড়ে না। স্বপ্নকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। স্কুলের স্বাভাবিক সন্তানদের মা'রা তার স্বপ্নকে নিয়ে হাসাহাসি করে, ছবি আহত হয় কিন্তু প্রতিবাদ করে না। দিন দিন স্বপ্নও স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

স্বপ্নকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে সবাই করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়, তার দৃষ্টির আড়াল হলেই অন্য ছেলে-মেয়েরা স্বপ্নকে কষ্ট দেয়। এসব দেখে ছবি খুব কাঁদে, নিজেকে বোঝায়; আবার এক সময় নিজেই শান্ত হয়। কিন্তু যখন তার আত্মীয়দের মাঝে স্বপ্নকে নিয়ে বেড়াতে যায় তখন তাদের সহানুভূতিসুলভ মিষ্টি কথার ছুরি ছবিকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। আপনজনদের এমন অবহেলা, বিদ্রূপ সে সইতে পারে না। অসহায় হয়ে দেখে, তার ভাইবোনের বাচ্চাগুলো কীভাবে স্বপ্নকে কষ্ট দিচ্ছে, আর এসব দেখে তার ভাই-বোনেরা হাসছে।

সেদিন থেকে ছবি সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে স্বপ্নের অনাদর হবে সেখানে সে যাবে না। ছবি ভাবতে লাগলো, স্বপ্ন কার কার কাছে থাকলে ভালো এবং আনন্দে থাকে। খেয়াল করে দেখলো, বাড়ির দারোয়ান স্বপ্নের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, সারাক্ষণ তাদের খুনসুটি লেগেই থাকে, এছাড়া এলাকার প্রায় সব রিকশাওয়ালাই স্বপ্নকে চেনে, কোথাও ঘুরতে বের হলে তারা হেসে আন্তরিকতার সাথে স্বপ্নের সাথে কথা বলে, গল্প করে। ছবি বুঝে যায়, স্বপ্ন এদের কাছেই ভালো থাকে।

ছবি কোনোভাবেই হারতে রাজি নয়। সে স্বপ্নকে নিয়মিত ডাক্তারের চেক্আপ-এ রাখে, আর বাসায় স্বপ্নের জন্য কিছু থেরাপী এবং মোটিভেশন পদ্ধতি শিখে নেয়। ছবি সারাক্ষণ স্বপ্নকে সঙ্গ দিতে থাকে, আর চারপাশের যারা স্বপ্নকে ভালোবাসে তাদের সান্নিধ্যে নেয়ার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে স্বপ্নের সাথে বস্তির কিছু ছেলের ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, তারা স্বপ্নকে বোঝে। ছবি প্রতিদিন বিকালে স্বপ্নকে নিয়ে বস্তির পাশের মাঠে এসব বন্ধুদের সাথে খেলতে নিয়ে যায়। ছবির ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং চার পাশের এ সকল অনাত্মীয় ভাল-মানুষের সাহচর্যে স্বপ্ন ধীরে ধীরে কিছুটা সুস্থ হতে থাকে।

ছবি সাহস করে আবার স্বপ্নকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। স্বপ্ন এখন আর ক্লাসে অস্বাভাবিক আচরণ করে না। কিন্তু সে নিশ্চুপ থাকে, কারও সাথে মেশে না, তার নিজের দুনিয়ায় সে বিচরণ করে, কেউ তাকে বিরক্তও করে না। স্বপ্ন অল্পদিনেই শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠে। ক্লাসের যে কোনো অঙ্ক সে অনায়াসে সমাধান করতে পারে কেবল তার ক্লাসের না, উপরের ক্লাসের যে কোনো অঙ্কও সে খুব সহজে সমাধান করতে পারে। আর তার এই গণিত-প্রীতি ক্লাস রুম ছাড়িয়ে স্কুলের সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে এবং খুব সহজে সে সকলের প্রিয়মুখ হয়ে উঠে।

স্বপ্নের গণিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক গণিত অলিম্পিয়াডে তার নাম পাঠিয়ে দেয়। অলিম্পিয়াডের বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সে প্রশ্নগুলো খুব ভালোভাবে সমাধান করে জাতীয় পর্যায়ের জন্য কোয়ালিফাই করলে যেন স্কুলের সকলে খুশির জোয়ারে ভেসে যায় ।

ছেলের সাফল্যে ছবির চোখে পানি চলে আসে, মুহূর্তের জন্য তার ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো আবারও মানসচোখে ভেসে উঠে। সারাক্ষণ সে স্বপ্নকে ঘিরে থাকে।

কয়েকদিন পরে স্বপ্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্বপ্ন এ-পর্বে প্রতিযোগিতার সবগুলো অঙ্কের সমাধান করে বাঘা বাঘা সব প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিচারকগণ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে স্বপ্নের নাম ঘোষণা করে এবং সে আগামী আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ টীমের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়।

সারা দেশে স্বপ্নের নাম ছড়িয়ে পড়ে। টিভি, পত্রিকায় তার ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। স্বপ্ন বাড়িতে ফিরলে, ছবি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে; স্বপ্নকে জড়িয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। বিকাল থেকে সাংবাদিকেরা তার বাড়িতে ভিড় করতে থাকে কিন্তু ছবি গেটের দরজা না খুলে দুনিয়ার এসকল মেকি/স্বার্থপর মানুষ থেকে তার সন্তানকে আড়াল করে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে।

দিনান্তে ছবি একান্ত নিরালায় বসে কেবলই ভাবে সবশিশুই স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ, শুধু মানুষই তাকে অসম্পূর্ণ ভাবে। সব সন্তানই তার বাবা-মায়ের কাছে শ্রেষ্ঠ সন্তান। কোনো সন্তান দেখতে সুন্দর আবার কেউ অসুন্দর, কেউ স্বাভাবিক জীবন পায় তো কেউ অস্বাভাবিক, সবকিছুই বিধাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। একজন বিশেষ-শিশু তার বাবা মায়ের কাছে কখনও বোঝা নয়, তারা যদি এটা মেনে নিয়ে সন্তানকে বুকে আগলে রাখতে পারেন তাহলে অন্যদের অসুবিধা কোথায়? এই সকল বিশেষ-শিশুকে কষ্ট দিয়ে, ব্যঙ্গ করে কী লাভ? চলুন ওদেরকে বুকে টেনে নিয়ে একটু আদর করি, দেখবেন ওদের দুনিয়াটা পুরা রঙিন হয়ে যাবে।

(এই গল্পটি সকল বিশেষ সন্তানদের পিতামাতার সম্মানে উৎসর্গিত।)

A Job Battle of Honesty

Azmain-ar-rafi (Omi)
43rd Batch, BSc in CSE
ID : 163030101021

Once upon a time, there was an honest man named Marconi Gonzales, who was an assistant architect manager of Matthews construction firm, Mehendiganj, Bengalland. His salary was only 5,000 pound per month. His colleagues were Dipak Kumar, Khadiza Khatun and Fatima Ahmed and everyone of them used to draw 2500 pound per month. Marconi used to help Dipak finacially whenever Dipak was in problem. In a word, Marconi was friendly with Dipak.

One day, a construction client came to Marconi to pass his contract to build a tower with his towerplan. Marconi said to him, "Could I check your plan to build a tower, please?" The client replied, "Yes, of course" and showed the plan of building. But Marconi saw, there was a big problem that there were no space to park any car or bike and the expenditure plan is the worst. Therefore, Marconi refused his plan. The man wanted to bribe him but he refused instantly. The client left his chamber being angry but Fatima took him to her chamber and had two deals with him. One of the two deals is that she will pass the tower-plan with the bribe of 75,000 pound. Then, Fatima said to Dipak, "Do you get any financial help from Marconi?" Dipak replied, "Only 500 pound." Fatima said, "If you assist me to complete a task, I will give you 50,000 pound." Then he (Dipak) agreed to perform.

The next day, Fatima complained to the Managing Director Robert Matthews against Marconi that he had taken a bribe of 20,000 pound from the client of construction firm and she brought the man as witness. To be a witness, the man said, "When I went to Marconi to pass my contract, he agreed to pass my contract only by taking bribe of 20,000 Taka Managing Director Mr. Matthews called Marconi and said, "Did you take a bribe from the man to pass his contract?"

Marconi replied, "No, never".

Then, Robert checked the chamber of Marconi and got the bribe; therefore, Robert suspended Marconi and promoted Fatima to the chamber of the Marconi. In this case, Dipak and Khadiza supported Fatima's complain.

One month had been passed and in that time, Shika Kumar, the daughter of Dipak Kumar was sick, 50,000 pound had been spent but she was too sick to get well. Dipak asked Fatima to give him some loan but she refused to give him the loan, moreover, Khadiza threatened him, "If you bore Fatima, we will sack you as Marconi."

Dipak found no way to save his daughter. So, he went to Marconi and wanted for some money. But that time, Marconi refused him. Then Dipak went to Robert and told him the fact but that time, Robert also didn't believe him. He investigated it and found that Marconi didn't take any bribe from the client and Fatima and Khadiza lied. Therefore, he fired Fatima, Khadiza and Dipak and promoted Marconi cancelling his suspension order.

Now, Marconi is the architect manager and his salary is 25,000 pound.

কবিতা (ফিরে দেখা)

কালীপ্রসন্ন ঘোষ : পারিব না

শামসুর রাহমান : তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

পারিব না

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

'পারিব না' এ কথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

'পারিব না' বলে মুখ করিও না ভার
ও-কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার।
অলস অবোধ যারা
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখি নাকো তাদের আকার
তবে কেন পারিব না বলো বারবার?
জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।
হাঁটিতে শিখে না কেহ না-খেয়ে আছাড়।
সাঁতার শিখিতে হলে
আগে তবে নামো জলে,
আছাড় করিয়া হেলা হাঁটো বারবার
'পারিব' বলিয়া সুখে হও আগুসার।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতা-মাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন ?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুত্থুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন- তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে

মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দগ্ধ ঘরের।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাভিডসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে-জঙ্গলে ঘুড়ে-বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে-
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকেই আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণ	:	বিবাহ
হাবীবুল্লাহ সিরাজী	:	আমার একাত্তর
কামাল চৌধুরী	:	নাপিত সমাজ
সৈয়দ শফিউল ইসলাম	:	হারিয়ে যাব
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	:	ভাবনা
মাহ্‌বুব উল আলম	:	ইচ্ছে করে
Mahboob Ul Alam	:	Silence Sometimes Speaks
মুহাম্মদ আবুল হোসেন	:	ছন্দে ছন্দে বর্ণবোধ
জসীম খান	:	উত্তাল প্রেম যমুনা
আলমগীর কবির	:	শেষের মিলন
রেজিয়া খানম	:	অদম্য চাষবাস
মোঃ নাজমুল হক	:	মানবতার ডাক
মোঃ হাসিকুল আলম (আশিক)	:	একুশে ফেব্রুয়ারি
মোঃ শাকিল ইসলাম	:	শিক্ষক সে যে তুমিই
মোঃ আতাউর রহমান তুরাক	:	স্বাধীনতার ডাক
তামান্না বিনতে জাহের	:	প্রাবিয়ান
মোঃ খায়রুল ইসলাম	:	আলোর দিশারী
মার্জিয়া আক্তার মনি	:	আমার তুমি
Rabeya Khatun Bipa	:	A Villanelle Poem Gentle Breeze Blows before the Rain
রুমা আক্তার	:	ভালোবাসা
সুজানা সেতু	:	ইচ্ছে
মিফতাহুল জান্নাত মিষ্টি	:	হাসিতে মৃত্যু
মোঃ সানোয়ার হাসান চৌধুরী (সজীব)	:	আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি
মোঃ ইসহাক তালুকদার	:	ভাষাপ্রীতি
মোঃ রফিকুল ইসলাম	:	চিড়িয়াখানা
মাহ্‌ফিয়া আক্তার মিতু	:	কিছু কথা
তানজিনা নাজনীন	:	জীবনের শেষে
Safia Shahrin	:	Love

ছড়া

আবু হোসেন মোঃ ইখলাস : ছোট্ট খোকন

বিবাহ

নির্মলেন্দু গুণ

বিবাহ বাসরে বর-কনে দু'জনে
ঝলমল করা যে-নববস্ত্র পরে-,
তা তাহাদের স্থায়ী পোশাক নয়।

মাংস-পোলাও, মন্ডা-মিঠাই খেয়ে
অতিথিরা ঘরে ফিরে গেলে-
আমরা তো জানি, কেন
অতঃপর পৃথিবীর আলো নিভে যায়।

যার কমতি হলে বিবাহ হতো না-,
সেইসব নববস্ত্র এবং গহনা
কী অনাদরেই না মাটিতে লুটায়।

আমার একাত্তর

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

প্রবল বর্ষণ শেষে
তোমার সীমানা যদি ধীরে-সুস্থে বলে:
'দাঁড়াও সিরাজী!'
তবে তুমি আর কত মেঘের প্রহরী
আর কত অশ্রু-বিভাবরী?

অবিভাজ্য নিরাপত্তা যদি ইহ-কলা,
তার স্বার্থ টানে দক্ষিণায়
তাও বুঝি বিস্তারের অপার ক্ষমায়
সঙ্গী করে পর-বিদ্যা, অসীম মঙ্গল!

অবধারিত কর্ষণ শেষে
সন্ধিসূত্রে জল
যদি বলে: 'নামো!' তবে
তোমার সত্তর আর তুমি
মিলে একাত্তর!

নাপিত সমাজ
কামাল চৌধুরী

এতদিন যা লিখেছি, দেখছি আজ তার দাঁড়ি গোঁফ গজিয়ে গেছে
বন্ধুরা বলছে, কাটো, কাটো

আমাদের নাপিত সমাজে একদিন সিজার্স ব্র্যান্ডের সিগারেট ফোঁকা ছাড়া
অন্য কিছুর সঙ্গে বিরোধ ছিল না।
তবু এই অসম দ্বৈরথে ছোটবেলার মতো পাছায় ইট বিছিয়ে বসে যাচ্ছি
যে কোনো গাছের তলায়
বাহবা দিচ্ছে কাঁচি, অভয় দিচ্ছে ক্ষুর

কাটো, কাটো, হে কবিতা তোমারও রক্তপাত চাই।

হারিয়ে যাব

সৈয়দ শফিউল ইসলাম

যেদিন আমি হারিয়ে যাব
সেদিন আমায় কেউ পাবে না
থাকবে শুধু স্মৃতি আমার
এসব কথা কেউ বোঝে না।

হারিয়ে যেদিন যাব আমি
আকাশ পাতাল খুঁজবে তুমি,
ধরাধামে পড়বে ঢলে
আমায় খুঁজে আর পাবে না।

হারিয়ে যাবার কালে আমার
কেউ হবে না সঙ্গী ধরার
থাকবে সবাই আপন তালে
খুঁজবে আমার সোনাদানা।

টাকা পয়সা জমিদারি
নেবে সবে বন্টন করি,
থাকবে পড়ে স্মৃতি আমার
সে স্মৃতি আর কেউ নেবে না।

স্বজনেরা আসবে ছুটে
প্রতিবেশী খুঁড়বে কবর
ছেলেমেয়ে করবে রোদন
আমার নাজাত কেউ দেবে না
স্বার্থে ভরা এই দুনিয়ায়
দুদিন পরে ভুলবে সবাই।

ভাবনা

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
বি,এল,কে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

আমাকে চেনো না আমি রোস্তম
বনি আদমের পুত-
আমায় দেখে ভয়ে ভয়ে চলে
মানুষ, জীন আর ভূত।

আমার সামনে মাথা উঁচু করে
এমন শক্তি কার?
বনের পশুরাও ভয়ে জড়সড়
শুনে মোর হুঙ্কার।

আমার এলাকায় আমার ইঙ্গিতে
মানুষ চলিতে বাধ্য
কিন্তু সারাদেশ নিয়ন্ত্রণ করা
আমার কি আছে সাধ্য!

বিশ্বের বুকে বাংলা তো একটা
ক্ষুদ্র তুচ্ছ দেশ
পৃথিবীতে আমার মূল্যায়ন কেমন
ভেবে ভেবে হই শেষ।

আবার ভাবি এই সৌরজগতে
পৃথিবী তো একটা গ্রহ
আমার দাপটে থেমে যাবে কিনা
তার সে চলার প্রবাহ।

লক্ষ কোটি এমন সৌরজগত
আছে শুনি মহাকাশে
রোস্তমের শুনেছে কি তারা
কাঁপে নাকি ভয়ে এসে।
যদি তা না হয়, তবে কেন আমি
মিছে করি এত গর্ব

দম ফুরালেই শেষ হয়ে যাবে
আমার সকল দর্প।

আমার মত কত রোস্তম
পরপারে দিল পাড়ি
আমাকেও কি তবে চলে যেতে হবে
এই পৃথিবীটা ছাড়ি?
তাই যদি হয় আমার এই গর্ব
আমার এই অহংকার।
অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ, নগন্য-
ভেঙ্গে হোক চুরমার।

আমি ক্ষমা চাই, ফিরে যেতে চাই
তাঁহারই চরণ তলে
যাহার হুকুমে রাত দিন হয়
বিশ্বজগত চলে।

ইচ্ছে করে

মাহবুব উল আলম
প্রফেসর, শিক্ষা বিভাগ

শিশিরভেজা ঘাসের উপর হাঁটতে ইচ্ছে করে
নদীর জলে পা ভিজিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে
নদীর ধারে আমবাগানে বসতে ইচ্ছে করে
তারার নীচে মধ্যরাতে শুতে ইচ্ছে করে
জোছনায় স্নান করতে বড্ড ইচ্ছে করে
কাঁঠালচাঁপার গন্ধ শুঁকে মরতে ইচ্ছে করে
পুকুরের টলটলে পানি শুষতে ইচ্ছে করে
শরৎভোরে শিউলিরেণু মাড়াতে ইচ্ছে করে
আকাশের নীল সবটুকু শুষতে ইচ্ছে করে
জ্যৈষ্ঠদুপুর পুকুরজলে সাঁতরাতে ইচ্ছে করে
মধ্যরাতে তোমার খোঁপা খুলতে ইচ্ছে করে
অলস দুপুরে তোমার দ্বারে যেতে ইচ্ছে করে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছুটতে ইচ্ছে করে
নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি যেতে ইচ্ছে করে
নীল আকাশে পাখির মত উড়তে ইচ্ছে করে
নদীর জলে পা ডুবিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে
সুখসাগরে কাটতে সাঁতার বড্ড ইচ্ছে করে
নদীর জলে স্নান করতে বড়ই ইচ্ছে করে
জোছনারাতে উঠোনে ঘুমোতে ইচ্ছে করে
মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে বড্ড ইচ্ছে করে
পর্ণ কুটিরে মাদুর পেতে শুতে ইচ্ছে করে
ভালবাসা সারা অঙ্গে মাখতে ইচ্ছে করে
তোমার গ্রীবায় মাথা রেখে হাঁটতে ইচ্ছে করে
তোমায় নিয়ে ঘাসবিছানায় শুতে ইচ্ছে করে
তোমার বুকে মুখ গুঁজে থাকতে ইচ্ছে করে
তেত্রিশ বছর কেমন আছো জানতে ইচ্ছে করে
আমায় মনে রেখেছ কিনা জানতে ইচ্ছে করে

আমায় নিয়ে কী ভাবো তা জানতে ইচ্ছে করে
আমায় ক্ষমা করেছ কিনা জানতে ইচ্ছে করে

বৃক্ষ আমায় টানত না এখন আমায় টানে
সবুজ শ্যামলিমা সুর তোলে মোর কানে
ভেসে যেতে ইচ্ছে করে কুমার নদের বানে
মন যে আমার পড়ে আছে এখনও ঐখানে

ইচ্ছে করে বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজতে
সিক্তবসনা কোমল নারী দেখতে
তোমার সাথে খুনসুটি করতে
তোমায় সাথে নিয়ে সিনেমা দেখতে
তিন দিন দেখেছিলাম আর ত দেখিনি
শত ইচ্ছায়ও সুযোগ আর জোটেনি
ভাল লাগে আকাশের তারা গুনতে
ভাল লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে
ভাল লাগে মধুর স্বপ্ন দেখতে
ভাল লাগে তোমায় ভালবাসতে
ভাল লাগে আড্ডা মারতে
স্বপ্নের ভেলায় ভাসতে মন ভাল থাকলে
নির্জন ঘরে একা তোমায় পেলে
তোমার ভালবাসা অঙ্গে মাখতে পারলে
ভাল লাগে তোমায় ভালবাসতে
ভাল লাগে তোমায় আদর করতে
ইচ্ছে করে তোমায় নিয়ে থাকি
ইচ্ছে করে তোমায় ভালবাসি
এত এত ইচ্ছে নিয়ে কেমন করে বাঁচব
এত ইচ্ছের যন্ত্রণা কেমন করে সইব
ইচ্ছের ডানা উড়তে কেন চায়
জানেই ত সে কিছুই যে না পায়

গাধাদের ইচ্ছে কোনো থাকতে নেই
গাধারা কিছুতেই পায় না কোনো খেই

Silence Sometimes Speaks

Professor Mahboob Ul Alam
Department of Education

The wind became angry
And began to blow from the west
Sky was overcast with cloud
Under thick setting of the region
Profound charming grace
And splendid lustre of sensation
Grew slowly in yours
We participated in vibrating sentimental journey
We walked through thousand years
We sailed our boat
And our hope lamp was brightened
We remained silent and did not speak
Our eyes full of dream remained unperturbed
Our heart-lotus started to bloom

Sky remained full of stars
And full moon in ruddy glow
The wind lifted your veil
And your smooth glossy hair
Started to fly in the air
And covered my face as flame of fire
My eyes full of dream
Could not see your lovely face
Flowers blossomed our garden
And we were plucking flowers from each other
Pleasure began to flow in our streams
Our mortal framed body began to bubble
Remaining in the celestial abode
And silence began to speak

ছন্দে ছন্দে বর্ণবোধ

মুহাম্মদ আবুল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গাইতে গেলে গান যেমন 'সা-রে-গা-মা' শিখতে হয়,
ভাষাবোধেও লাগে তেমন সঠিক বর্ণ-পরিচয় ।
বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটি আছে সরল বর্ণ,
এগারোটি স্বরবর্ণ, বাকি ব্যঞ্জনবর্ণ!
এর বাইরেও, আরো-কিছু যুক্তবর্ণ পাই
জানতে হবে সঠিকভাবে তাদের পরিচয় ।

'অঙ্গ, বঙ্গ, রঙ্গে' আছে যুক্তবর্ণ 'ঙগ'(উঁয়ো-গ),
'রঞ্জন' ও 'ব্যঞ্জনে' আছে 'ঞ' আর 'জ' (বর্গীয়-জ)।
'জ' আর 'ঞ' দিয়ে, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' লিখতে হয়,
না-জানলে থেকে যাবে সারা-জীবন 'অজ্ঞ' ভাই ।

'মঞ্চ, পঞ্চ, সঞ্চয়ে'তে যুক্তবর্ণ 'ঞচ',
'অবাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়'–লিখতে লাগে 'ঞছ'।

'ট'-বর্গীয় বর্ণ-সনে যুক্ত হয় 'ণ'(মূর্ধন্য-ণ),
'ঘণ্টা, কণ্ঠ, পণ্ডিতে' তাই দিতে ইহবে 'ণ'।
তবে, ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়–
'ঠান্ডা-ডান্ডা, আন্ডা-গন্ডা, গন্ডার' আর 'ভন্ডুল'-এ,
'লণ্ঠন, ষন্ডা-গুন্ডা, কান্ডারি' আর 'গন্ডগোল'-এ!
আবার, অভিধানেই দেখতে পাই-
'লন্ডভন্ড, পান্ডা, মন্ডা'–দু'ভাবেই লেখা যায়।

'ত'-বর্গীয় বর্ণ-সনে, যুক্তহয় 'ন'(দন্ত্য-ন),
'দন্ত, গ্রন্থ, ছন্দ, গন্ধে'–সর্বত্রই 'ন'।

'বৈষ্ণবী'য় 'তৃষ্ণা' নিয়ে 'কৃষ্ণ'কে যে পেতে চায়,
'ষ' ও 'ণ'-এর যুক্ত-স্বরূপ জানা চায়।
'ষ' ও 'ণ' আছে–'বিষ্ণু' এবং 'উষ্ণতা'য়,
'চলিষ্ণু' ও 'কৃষ্ণচূড়া'ও এই-নিয়মেই লিখতে হয়।

হয় যদি কেউ 'ব্রাহ্মণ' কিংবা জন্ম 'ব্রাহ্মণবাড়ীয়া'য়,
'হ' ও 'ম'-এর যুক্ত-স্বরূপ না-জেনে তার উপায় নাই।

'হ' ও 'ম' যুক্ত আছে–'ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মা'তে,
আরও আছে 'ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রাহ্মা'তে।

'চিহ্ন' শব্দের যুক্তবর্ণে 'হ'-এ 'ন' যুক্ত হয়,
'বহ্নি' এবং 'মধ্যাহ্ন'ও –একইভাবে লিখতে হয়।

'ণত্ব'-বিধান অনুযায়ী দুটি বানান ভিন্ন হয়
'অপরাহ্ণ' ও 'পূর্বাহ্ণ'তে 'হ'-এ 'ণ' যুক্ত হয় ।

'ছিন্ন , ভিন্ন, অন্ন'তে হয়–'ন' যোগ 'ন' ,
'তন্নতন্ন, নবান্ন'তেও 'ন' ও 'ন'।

'বিষণ্ন'তে 'ণ'-এ 'ণ' যুক্ত হয় ,
একইভাবে, এই-নিয়মে 'ক্ষুণ্ন' শব্দ লিখতে হয়।

'নিম্ন' শব্দে যুক্ত হয় 'ম'-এর সাথে 'ন',
'জন্ম' এবং 'উন্মাদে' হয় 'ন' যোগ 'ম'।

'উন্মীলন' ও 'উন্মেষে'ও, 'ন' যোগ 'ম' ,
'সম্মান' এবং 'সম্মানী'তে, 'ম'-এর সাথে হবে 'ম'।

'আত্মীয়'তে যুক্তবর্ণে 'ত'-এর সাথে আছে 'ম',
'রত্ন'-'যত্নে' দিতে হবে 'ত'-এর নিচে 'ন'!

'লক্ষ' শব্দের যুক্তবর্ণে –আছে 'ক' ও 'ষ' ,
'লক্ষ্মী' লিখতে তার সাথে যুক্ত-করতে হবে 'ম'।
'সূক্ষ্ম'তেও, 'ক'-এর সাথে 'ষ' ও 'ম' ,
'তীক্ষ্ণ'তে, 'ক' ও 'ষ'-'ণ'।

'শৃঙ্খলা'তে 'ঙ'র সাথে যুক্ত হয় 'খ',
'আকাঙ্ক্ষা'তে 'ঙ'-র সাথে 'ক্ষ'।

'ধাক্কা, পাক্কা, ছক্কা' শব্দে–'ক'-এ 'ক'-এ যুক্ত হয়,
'পক্ব' এবং 'নিক্বণ'-এ, 'ক'-এর সাথে 'ব' হয় ।

'আহ্লাদ' এবং 'প্রহ্লাদ'-এ, 'হ'-এর সাথে আছে 'ল',
'আহ্বান' লিখতে, 'হ'-এর সাথে যুক্ত করতে হবে 'ব' ।
'জিহ্বা, বিহ্বল, গহ্বর'ও, এম্‌নি-করেই লিখতে হয়;
শব্দ-ক'টির 'উচ্চারণে'ও, বিশেষ-রীতি মানতে হয়।

'অট্টহাসি'–'অট্টালিকা'য়, নেই কোথাও 'র-ফলা',
'ট'-এর পিঠে 'ট'-বসালেই, হয়ে যাবে 'চট্টলা' ।
'চট্টগ্রামে', 'ট'তে নয়, 'গ'-এর সাথে 'র-ফলা',
'ট্রাফিক, ট্রফি, ট্রামে' লাগে 'ট'-এরসাথে 'র-ফলা'।

'এ'র উপরে মাত্রা দিলে, 'ত্র'('ত'-এ 'র-ফলা') হয় ,
এম্‌নি-করেই 'ছাত্র, নেত্র'–শব্দগুলো লিখতে হয়।

'ও'র উপরে মাত্রা দিলে, 'ত'-এ 'ত'-এ যুক্ত হয় ;
'বৃত্ত, দত্ত, চিত্ত, বিত্ত'–এই-নিয়মে লিখতে হয় ।

'অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্রে' আছে–'স্ত্র'('দন্ত্য-স'-এ'ত'-এ 'র-ফলা');
'সহ্য-দাহ্য-বাহ্যিক'-এ হয়–'হ'-এর সাথে 'য-ফলা'(্য) !

'শত্রু' এবং 'শুক্র' যেমন নয় কখনো 'এক' নয়,
'ত্রু'('ত'-এ 'র-ফলা' উ-কার) আর 'ক্র'('ক'-এ র-ফলা) ও'এক' নয়।

আছে এমন আরো-কিছু 'বর্ণ' এবং 'চিহ্ন',
জানতে হবে স্বরূপ তাদের, সু-লিখনের জন্য।
যতিচিহ্ন 'কোলন(:)' এবং বর্ণ 'বিসর্গ(ঃ)'
নাম-পরিচয় ভিন্ন যেমন, কাজও স্বতন্ত্র।
'বিন্দু(.)' এবং 'শূন্য(০)' যেমন নয়কো একার্থক,
'হাইফেন(-)'এবং 'ড্যাশ(-)' তেমন ভিন্নার্থের দ্যোতক।

'বর্ণবোধ'-এর পাশাপাশি, জানতে হবে বানান-রীতি,
'বলতে-পড়তে' শিখতে হবে উচ্চারণের রীতি-নীতি।
সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে দিনের যেমন শুরু হয়–
বর্ণবোধের শিক্ষা তেমন শৈশবেতেই নিতে হয়।
পলে পলে বাড়লে বেলা, রক্ত-রবি দীপ্ত হয়,
ভাষা-জ্ঞানও ধীরে ধীরে, দিনে দিনে ঋদ্ধ হয় ।
থাকে যদি অন্তরেতে ভাষার প্রতি ভালোবাসা,
যাবেই যাবে সঠিকভাবে মিষ্টি-মধুর ভাষা-শেখা।

উত্তাল প্রেম যমুনা

জসীম খান
প্রভাষক, প্রাইম ইউনিভার্সিটি ল্যাংগুয়েজ স্কুল

মিনতি করি তোমায়,
ভুল বুঝো না আমায়।
কত কথা কত ব্যথা,
কত আশা কত ভালোবাসা,
রেখেছি মনে সযতনে,
করেছি লালন মগজে মননে।

কোনো এক সন্ধিক্ষণে সংগোপনে,
কোনো এক বারি-ধারায় চোখের ইশারায়,
আলো-আঁধারের স্বপ্নিল খেলায়,
বেলায় অবেলায় জোছনা রাতের মেলায়,
হৃদয়ের সব প্রেম ঢেলে দেব তোমায়,
কাটাব অনন্তকাল ফুলশয্যায়।

থেকো না দূরে লোকলজ্জায়,
চেয়ে দেখো চোখে চোখে
দেখা হবে মনে মনে
বিস্ময়কর স্বর্গ-উদ্যান কতই না আতশবাজি
উত্তাল প্রেম-যমুনা, চলে তরী, লাগে না মাঝি,
চলে এসো আজই, পথ চেয়ে আছি।

শেষের মিলন

আলমগীর কবির
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

কোনো এক মৃত্যুর মিছিলে আমারও মৃত্যু হবে।
সাতাশ বছর পরে থাকবে বেওয়ারিশ লাশ,
অজানা কোনো এক গণকবরে।
হঠাৎ একদিন কেউ এসে পরিচয় দিয়ে বলবে,
ভালোবেসেছিলাম তাকে ।
তখন বাতাসে ভর করে অদৃশ্য দেহ উঠে আসবে
আলিঙ্গনের ছলে।

তার পর কেটে যাবে শত-সহস্র দিনরাত,
গলে যাবে হিমালয়ের বিশাল শৈলপাত।
একদিন, কোনো এক সন্ধ্যেবেলায়,
দ্বিতীয় মৃত্যু তোমার কোল জুড়ে।
ছিনিয়ে আনবে অধিকারের সম্পদ দাবী করে,
অতঃপর তোমার বাড়ির তুলশি গাছটার পাশে
আমার সমাধি হবে,
আর তোমার নিত্য পদাচরণা যেন সহস্র মৃত্যু
সমাধি ভেঙ্গে উঠার উপক্রম মৃত দেহের।
বহু প্রদীপ জেলেছ সমাধিতে তবু আলো পৌছায়নি,
তোমার জ্যোতিতে যে জীবন দীপ্তি পেয়েছিল,
দীপাবলির আলো যে সেখানে তুচ্ছ।
অপেক্ষার আরো পঁচিশ বছর পর,
আলো আসছে মাটিভেদ করে।
বিধাতার গড়া সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে,
আরো সুন্দরের খোঁজে তোমার আপনাতে ফেরা
এ যেন মৃতদেহের পুনর্জন্ম তোমার আলিঙ্গনে।

অদম্য চাষবাস

রেজিয়া খানম
কোর্স সেক্রেটারি, ইংরেজি বিভাগ

পেয়েছ বৈষয়িক
তাই পরমানন্দ জ্ঞান গেছে নিভে
চাওয়াগুলো সবই ঠিক কিন্তু প্রাপ্তিগুলো বৈষয়িক
তৃপ্তি না পেয়ে শুধু চষে বেড়িয়েছ।

যেহেতু লোকের ভালো চাও, তাই দেখে মায়া হয়, ভাবতে কষ্ট লাগে
চিনতে পারলাম যেদিন
নিবেদন করলাম মনে আর বসনে
যে পছন্দের কথা বলেছিলে একবার
যা কিনা সমাদৃত সুন্দর মনে, গ্রাম থেকে শহরে এ দেশটাতে।

সত্যি বড় দুর্ভাগা! কোথায় গেল আমাকে পাবার দুঃসাহস?
পাওয়া? বৈষয়িক না একেবারে
কী সুখ যে! বোঝাতে চেয়েছি মনে মনে
অস্থিরতা নেই, তবে আজ অব্দি বুঝলে না কী সে?

বস্তুনিষ্ঠ প্রেমে হয়েছ দুর্বল ও কাতর
তাই তো স্বর্গসুখ ছোঁয়াব
জিজ্ঞাসিবে আত্মাকে কেন পাইনি এতকাল?

জানি, চেয়েছ মনে মনে
শুধু পাওনি খুঁজে ।
জানতে না কত বড় প্রাপ্তি আর তৃপ্তি সম্মুখে
খোলসের মধ্যে মরা খোলস হয়ে রইলে
আঁখিটি মেলে দেখলে না বলে সত্যিটিও জানলে না।

মানবতার ডাক

মোঃ নাজমুল হক
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সেন্টার ফর রিসার্চ,এইচআরডি এন্ড পাবলিকেশন্স

এ জীবন তো কিছুই নয়
শুধুই পরীক্ষা মাত্র
পরোপকার আর মানবিকতা
হোক জীবনের পরম ব্রত।

চিরায়ত সত্যের অনুরণনে
বিদায় নিতেই হবে
একটু যদি দাগ রেখে যাই
সেটাই শুধু রবে।

অন্তহীন শূন্যে হারাবার আগেই
কিছু করে যেতে হবে আমাদের
অন্তত পাশে থাকা মানুষদের জন্য
দুঃখী জীবন যাদের।

সময়ের স্রোতে স্বার্থপরতায়
কভু না করে কুর্ণিশ
মানবতা ও মানুষের কল্যাণে
কাজ করে যেতে হবে অহর্নিশ।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের
হোক প্রকাশ আদর্শ ভাবনার
হোক সুদৃঢ় সুন্দর প্রত্যয়
জয় হোক মানবতার।

একুশে ফেব্রুয়ারি

মোঃ হাসিকুল আলম (আশিক)
এমএলএসএস

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
মায়ের দামাল ছেলে
পিচঢালা ঐ ঢাকার পথে
রক্ত দিলো ঢেলে।

মায়ের ভাষায় বলবো কথা
বজ্র শপথ দাবি
মায়ের এমন ভক্ত ছেলে
কোথায় খুঁজে পাবি
জীবন দিয়ে পূর্ণ করে
গেলো মনের আশা
কেড়ে নিতে দেয়নি তবু
মায়ের মুখের ভাষা।

খবরটা তাই পৌঁছে গেলো
বিশ্ববাসীর কানে
মাতৃভাষার জন্যে মানুষ
রক্ত দিতেও জানে।

এই পৃথিবীর ইতিহাসে
এমন নজির নাই
ওরাই আমার বাংলা মায়ের
অহংকারী ভাই।

শিক্ষক সে যে তুমিই

মোঃ শাকিল ইসলাম
৪৪তম ব্যাচ (ডে), ইইই
আই.ডি: ১৭১০৩০৩০১০১৭

হৃদয়ে জ্ঞানের আলোর স্পর্শ তুমি
জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতির প্রজ্ঞার প্রদীপ তুমি
আবদ্ধ চিন্তাকে উন্মুক্ত করতে শেখাও তুমি
হ্যা, শিক্ষক সে যে তুমিই...

জীবন যুদ্ধের আকাশের পাইলট তুমি
জীবন যুদ্ধের সমুদ্রে নির্ভীক নাবিক তুমি
জুলুমের প্রতিবাদ জাগানোর রণকণ্ঠস্বর তুমি।
হ্যা, শিক্ষক সে যে তুমিই..

সমাজ সংস্কারের প্রথম পাবক তুমি
জ্ঞানের পিপাসা তৈরিতেও তুমি
সেই পিপাসা মেটানোর দায়িত্বটাও নিয়ে যে থাক যে তুমিই
হ্যাঁ, শিক্ষক সে যে তুমি...

অজ্ঞতার অন্ধের দৃষ্টি ফেরাও তুমি
অহংকারীর মধ্যে চেতনার আলো জ্বালাও তুমি
জ্ঞানের ভুবনের পূর্ণিমার প্রভা সে যে তুমি
হ্যাঁ, শিক্ষক সে যে তুমিই...

এই বিশ্বভুবন মানুক আর নাই মানুক
শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র
জ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুজন

স্বাধীনতার ডাক

মোঃ আতাউর রহমান তুরাক
৪৬তম ব্যাচ, এল.এল.বি (অনার্স)
আই.ডিঃ ১৭৩০৫০১০১০০২

মাঝিদ,আইছত না কি বাপ?
বাপ দেখ সজনা ডাটায় ভরে গেছে গাছটা
হ, মা আমি এখন যাই, এ কিরে বাপ কই যাছ?
মা, ঐ শুনছো বাংলার বন্ধুর ডাক!
"এবারের সংগ্রাম,
আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম,
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।"
আমার যে যেতে হবে অনেক কাজ।
তোমাকে যে মুক্ত করতে হবে!
কি কছ এসব মুক্ত !
হ মা,তারা যে তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দিবে না,
তোমাকে শকুনের মত খাইতে চায়।
মা বলে: আমি মূর্খ মানুষ,এত শত বুঝি না।
আয় বাপ,তরে ভাত দেই।
তর পছন্দের সব খাওয়ন।
কাল বাউশের মুড়ি ঘন্ট
শিং মাছের লম্বা জুল আর কত কি।
আয় বাপ আয়, দুটো ভাত খেয়ে যা।
আয়তেছি মা,
বাপ কই তুই! কই তুই!
মা ঝাপশা চোখে তাকায়
উঠানের এখানে সেখানে, কোথায় গেলি কোথায় গেলি?
ছেলে যে দেশ মা'কে স্বাধীন করতে গেল,
আর খাওয়া হল না মুড়ি ঘন্ট আর লম্বা জুল।
দেশ মুক্ত হল, স্বাধীন হল, বাপ তুই কই?
তুই কই, সবাই আইল, তুই আইলি না।
বাপ কই তুই, কই তুই??

প্রাবিয়ান

তামান্না বিনতে জাহের
৪৭তম ব্যাচ, এল.এল.বি (অনার্স)
আই.ডি: ১৮১০৫০১০১০২৪

কোথায় আছো লুকিয়ে তোমরা?
জ্বলে ওঠো আপন শক্তিতে
দেখিয়ে দাও বাংলাদেশকে,
আমরাও পারি।

আমরা না হতে পারি পাবলিশিয়ান;
না হতে পারি বুয়েটিয়ান, রুয়েটিয়ান, সাস্টিয়ান
কিন্তু আমরাও ওদের মতন এক ধরনের কীট;
যারা একবার জেগে উঠলে
দমানোর ক্ষমতা কারোরই নেই।

দেখিয়ে দাও ওদেরকে যে,
প্রাবিয়ানরা ভীরু অজ্ঞ নয়।
সেরাদের মধ্যে আমরাও একদিন নাম লেখাবো।

আলোর দিশারী

মোঃ খায়রুল ইসলাম
৪৭তম ব্যাচ, ইইই
আই.ডি: ১৮১০৩০৩০১০৫০

বন্ধুরা শুনে যাও, যাও হে শুনে;
বঙ্গবন্ধুর নাম।
বঙ্গবন্ধু হলো বাংলাদেশের স্থপতি;
নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

যে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে লাখো মানুষের মাঝে;
যে আলোর দিশারী হয়েছে;
সেকালে, সাত কোটি বাঙালির চোখে।
যেখানে পদ্মা-মেঘনা এক হয়েছে;
উথাল-পাথাল ঢেউয়ে।

তোমরা বঙ্গবন্ধু নামটি শুনো নাইকো
সাত কোটি বাঙালির মুখে।
শত অঙ্গীকার, শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে;
যে নিয়েছিল মানব কল্যাণের শপথ।
পূরণ হয়েছে তা, রক্তে রাঙিয়ে;
ধুলিবালি সেই রাজ পথ।

তাজা তাজা প্রাণ হয়েছে বলীয়ান,
একটি মানুষের জন্য।
সেই মানুষটিই হলো বঙ্গবন্ধু
আজকের সোনার বাংলার স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু যখন বলেছিল
"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"
সেই পরাজিত শক্তিকে রুখে দিতে;
জনসমুদ্রে লাখো মানুষ, হয়েছিল একত্রে মহীয়ান।
সবার মনের মাঝে ছিল এক
আলোর দিশার নাম
সে যে ছিল বঙ্গবন্ধু আমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

আমার তুমি

মার্জিয়া আক্তার মণি
৪৮তম ব্যাচ, বি. এ (অনার্স), ইংরেজি
আই.ডি: ১৮২০৩০১০০৫

আমার তুমি
এক অবিশ্বাস্য কাঁথা
প্রথম এসেছিলে তুমি
বিদ্যালয়ের ওই আঙিনায়
ছিলাম আমি অজানা
তোমার মনের পাতায়
সেই অষ্টম প্রহরে
তোমায় লেগেছিল আমার ভালো
বুঝতে পারোনি তুমি
পড়েছো নতুন এক ফাঁদে
হঠাৎ একদিন
নিজের অজান্তে পারলে তুমি বুঝতে
হয়েছো আমার কবেই
বেখেয়ালে মনে পড়ে
দশম প্রহরের কথা
বানিয়েছিলে বন্ধু আমায়
আস্তে আস্তে বন্ধু হয়ে
এসেছিলে আমার খুবই কাছে
আমি কিনা অবুঝ
বুঝতামই না কী আছে তোমার মনে
বুঝিয়েছিলে তুমি সেইদিন
আম গাছটির নিচে
বললে আমায় ডেকে তুমি
তোকে আমি ভালোবাসি

A Villanelle Poem
Gentle Breeze Blows before the Rain

Rabeya Khatun Bipa
48 Batch, MA in English Language Teaching
ID: 182010102010

Gentle breeze blows before the rain,
Raindrops come with the odor of clay;
Oh rain, I want to feel you again!

Joy in heart the farmers gain,
Recall the myth like the color gray
Gentle breeze blows before the rain.

Children dance and play in the rain
And the moments they cheer in the way,
Oh rain, I want to feel you again!

Lovely day couples pass together in fain,
Feel the raindrops like a bay,
Gentle breeze blows before the rain.

Animals quest for harbor in chain
Some love and love to play,
Oh rain, I want to feel you again!

Rainbow shines beautifully after the rain,
Enhances the brightness of the day.
Gentle breeze blows before the rain.
Oh rain, I want to feel you again!

ভালোবাসা

রুমা আক্তার
৪৯তম ব্যাচ, এলএলবি (অনার্স)
আই.ডি: ১৮৩০৫০১০১০০৪

কষ্ট কি শুধু তোমার হয় বাবু
আমারও তো হয়
যতবার যাই দূরে ততবার
কষ্ট হয় আমারও এই মনে
কখনো কি বুঝেছো
তোমাকে ছাড়া কতটা
কষ্ট জমা এই মনে
জানি না কখনো
পারব কিনা বুঝাতে
তোমাকে না পেলে
বাঁচব কেমন করে
তোমাকে ছাড়া চলা কত যে কঠিন
জানে না তো আমি ছাড়া কেউ
এত ভালবাসি তোমায়
বুঝাতে পারি না কভু
জানিনা কখনো
বুঝেছো কি আমায়
জানি না কখনো
বুঝেছি কি তোমায়
জানি না কী করে
ভালবেসে ফেলেছি তোমায়
এত কষ্ট দাও তুমি
তবুও ফিরে আসি
কতটুকু বাসলে ভালো
ভরবে তোমার মন
বন্ধু তোমায় আকাশ দেব
দেব ফুলের মালা
তুমি শুধু মনে রেখো
আমায় সারা বেলা
চোখের কান্না মুছে দেব
দেব তোমায় হাসি
মনে রেখো বন্ধু তোমায়
অনেক ভালোবাসি

ইচ্ছে

সুজানা সেতু
৪৯তম ব্যাচ, বিবিএ
আই.ডি: ১৮৩০২০১০১০৩৬

ইচ্ছে করে পাখির মতো
ডানা মেলে উড়তে
ইচ্ছে করে মনের সুখে
সারা জীবন ঘুরতে
ইচ্ছে করে শালিক হতে
হতে দোয়েল টিয়ে
ভুবনটাকে দেখব আমি
দূর থেকে দূরে গিয়ে
ইচ্ছে করে উড়তে আমার
গাছের ডালে ডালে
ইচ্ছে করে দেখতে এ দেশ
দুচোখ মেলে মেলে।

ভাবি আমি দূর আকাশে
কেমন করে উড়বো?
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
দূর থেকে দূর ঘুরবো।
কেমন করে ঘুরব এদেশ
নই যে আমি পাখি,
ছোট্ট মনের ইচ্ছেগুলো
মনেই আগলে রাখি।

হাসিতে মৃত্যু

মিফতাহুল জান্নাত মিষ্টি
৪৯ তম ব্যাচ, এলএল.বি
আই.ডি: ১৮৩০৫০১০১০৫৪

চেয়ে চেয়ে ভুল পথে
করেছি গমন,
নতুন পথ খুঁজে খুঁজে
হারিয়েছি প্রিয়জন,
নিশিরাতে জাগিয়ে যারে
করিতে স্মরণ,
আজ বড় স্বার্থপর সে
ভুলে গেছে জীবন

ফুল যখন হারিয়ে যায়
ভোমরের টানে,
কি আর করা খারাপ
ভোমর সে
ফুলে কি আর পোষ মানে?

সময় হারিয়ে গেলেও
ঘড়িটি সমান চলে,
ভোমর হারিয়ে গেলেও
সে কি আর মধুর খোঁজ করে?
ফুল ফুল করে করেছি বাগানবাড়ি
সে বাড়ি আর বাড়ি নাই,
হইছে অভিশপ্ত হাড়ি।

হাসতে হাসতে গেল সময়
দেখালম না পিছু,
বিষাক্ত সাপ মারিল ছোবল
কোকিয়েছি শুধু,
জীবন গেল অবুঝে অবুঝে
চাওয়ার কিছু নাই,
হাসিতে হাসিতে হল মৃত্যু
বিষাক্ত দাঁতের ছোবল ছিল তাই।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি

মোঃ সানোয়ার হাসান চৌধুরী (সজীব)
৫০ তম ব্যাচ, এলএলবি (অনার্স)
আইডি: ১৯১৫০১০১০৩৮

জন্ম আমার নব্বই এর দশকে
তাই আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
আমি দেখিনি কিভাবে বীর বাঙালি
ভাষার জন্য নিজের রক্তে রঞ্জিত করেছে রাজপথ।
আমি বঞ্চিত হয়েছি বঙ্গবন্ধুর রক্তে আগুন ঝরা
স্বাধীনতার বীজমন্ত্র শোনা থেকে।

জন্ম আমার নব্বই-এর দশকে
তাই আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
আমি দেখিনি পাক সৈন্যের
সেই বর্বরোচিত অপারেশন সার্চলাইট।
আমি দেখিনি কিভাবে মায়ের বুক থেকে
কেড়ে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমার ভাইদেরকে।
আমি দেখিনি কীভাবে রক্তের বিনিময়ে বীর বাঙালি অর্জন
করেছে রক্তিম পতাকা।

জন্ম আমার নব্বই এর দশকে
তাই আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
আমি দেখিনি কীভাবে এঁকেছে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র
কিভাবে রেখেছে মায়ের ভাষার মান,
কারণ জন্মটা আমার ঠিক নব্বইয়ের শেষ দশকে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি,
সত্যিই আমি দেখতে পারিনি সেই ৫২ থেকে ৭১ এর বর্বরতা,
আমি দেখতে পরিনি সেই ভয়াবহ ৭৫ এর ১৫-ই আগস্টের
কালো রাত,
যে রাতে জাতি হারিয়েছিল তাদের পিতা,
বাঙালি হয়েছিল মেধাশূন্য।

কিন্তু আমি দেখেছি রাজাকারদের বিচার
দেখেছি জাতির পিতা হত্যার বিচার
আমি ভাগ্যবান, আমি ভাগ্যবান কারণ-
আমি বলতে পারি, আমরা বাঙালি বীরের জাতি,
আমি বলতে পারি, আমরা মাথা নত করিনি,
আমি বলতে পারি, আমাদের প্রতিটা অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা,
আমি বলতে পারি, আমাদের ইতিহাস রক্ত দিয়ে গড়া।
আমি বলতে পারি আমরা বীর বাঙালি।

ভাষাপ্রীতি

মোঃ ইসহাক তালুকদার
৫০ তম ব্যাচ, এমএ,ইংরেজি
আই.ডি: ১৯১০১০১০২০১৪

মুখের ভাষার জন্য
শত্রুতে হলাম গণ্য
বাঙালি তোদের জীবন ধন্য
বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা
বসে থাকলো না জেলেরা
রাস্তায় নেমে এলো কৃষক-শ্রমিক,
ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা
ভাঙ্গা হলো ১৪৪ ধারা
অকাতরে জীবন বিসর্জন দিলো যারা
সালাম-রফিক, জব্বার-বরকত হলো তারা
নাম না জানা আরো কত হলো মারা
বাঙালি জাতি বীরের জাতি
মরলে তাতে কী হলো ক্ষতি
বাংলা ভাষার দাবি
ফিরিয়ে না দিয়ে নাই যে তোদের গতি
অন্যথা মোচড় খাবি কানের লতি
মায়ের ছেলে মায়ের ভাষায় বলবে কথা
তাতে তোদের কেন এত ব্যথা
ব্যথায়-কথায় লাগল যে দ্বন্দ্ব
বাঙালি জাতির কণ্ঠ চিরতরে করতে চাইলি বন্ধ
দ্বন্দ্ব-বন্ধে হলো যে তোদের মন্দ
ভেঙ্গে গেল ভাতৃপ্রতিম দেশের স্কন্ধ
বাংলা ভাষার দাবিতে
সোচ্চার হলো বাঙালি জাতিতে
জঙ্গলের মঙ্গল হলো হাতিতে

জেলের তালা ভাঙ্গা হলো লাথিতে
অবশেষে বোধোদয় হলো তোদের মতিতে
বীর বাঙালি অটল রইল তাদের গতিতে
প্রাণের দাবী বাংলা, মোদের আশা
স্বীকৃতি পাক রাষ্ট্রভাষা, বাংলাভাষা
নইলে তোদের ছাড়তে হবে খাসা
আন্দোলনের স্বীকৃতি পেল ভাষা নিজ
বাংলার মাটিতে রোপিত হলো স্বাধীনতার বীজ
যে জাতি মাকে শ্রদ্ধা করতে জানে
সে জাতি কখনও পরাধীনতা না মানে
জানায়-মানায় চললো আন্দোলন স্বাধীনতা
গ্লানি গুছিয়ে গেল পরাধীনতা
বাঙালি জাতির আছে শৌর্য-বীর্য
ছিনিয়ে আনলো স্বাধীনতার সূর্য
সাবাস সাবাস সাবাস বীর বাঙালি
হতে যেও না কারও কাঙালি
মায়ের ভাষা, মায়ের আশা
স্বনির্ভরতায় গড়ো নিজ ভাষা
গড়তে হলে নিজ দেশ
ভুলতে হবে রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষ।

চিড়িয়াখানা

মোঃ রফিকুল ইসলাম
৫০ তম ব্যাচ, ইইই
আই.ডিঃ ১৯১০৩০৩০১০৩২

নরেন বাবুর আজকে ছুটি দিনটা শুক্রবার,
চোখে-মুখে ঝিলিক মারে আনন্দ আজ তার।
আজকে তিনি ঘুরতে যাবেন মিরপুর চিড়িয়াখানা,
দেখবেন কত পশুপাখি, যত তাদের ছানা।
এই না ভেবে নাকে-মুখে গুজে চারটি ভাত,
যত্ন করে পরেন তিনি সুন্দর একটা শার্ট।
কাপড়-চোপড় পরে বাবু রওনা দেন দ্রুত,
থোড়াই কেয়ার আজকে শুধু সকল রকম ছুতো।
মিরপুরের এক বাস দেখে দ্রুত উঠে পড়েন,
পিছনে এক ছোকরা বলে-এই দাদা সরেন।
সকাল বেলায় নরেন বাবুর মেজাজ গেল চড়ে,
ইচ্ছে করে চড় মেরে দেন কষে আচ্ছা করে।
কিন্তু বাসটা ক্লাস তো নয়, আর ছোকরা ও নয় ছাত্র,
এই না ভেবে নরেন বাবুর জ্বলে সারা গাত্র।
দুলতে দুলতে লোকের চাপে হয়ে চিড়েচ্যাপ্টা,
পকেট থেকে হারিয়ে ফেলেন চিড়িয়াখানার ম্যাপটা।
টিকেট কিনতে যান তিনি টিকেট কাউন্টারে,
আশেপাশের গাড়িগুলো কালো ধোঁয়া ছাড়ে।
টিকেট কেটে চিড়িয়াখানায় দ্রুত ঢুকে পড়েন,
কলার খোসায় পিছলা খেয়ে উল্টা হয়ে পড়েন!
আশেপাশের শিশুরা সব হাসে হি হি করে,
লজ্জায় এখন নরেন বাবু যাচ্ছেন বুঝি মরে।
ধুলোর মধ্যে নরেন বাবু খাচ্ছেন গড়াগড়ি,
মনে মনে বলেন তিনি, বাঁচাও, ও রাম হরি!
ধুলো থেকে উঠে যান বাঘের খাঁচার দিকে,
আজ সবারে দেখিয়ে দেবেন, চাপড় মারেন বুকে।
বাঘের দিকে এগিয়ে গেলেন ফুলিয়ে বুকের পাটা,

হঠাৎ বাঘটা গর্জে উঠল, গায়ে দিলো কাঁটা।
গর্জন শুনে নরেন বাবু উল্টা ঘুরে দৌড়,
মনে হলো বাঘ এ-তো নয় মানুষ মাংসখোর!
নরেন বাবু চেঁচিয়ে উঠেন, বাঁচাও বাঁচাও বাঘ!
চিৎকার শুনে বলল সবে, ভাগরে সবাই ভাগ!
বাঘ ব্যাটা বেরিয়ে গেছে ভেঙে লোহার খাঁচা!
সবাই ছুটছে গেটের দিকে আপনার জান বাঁচা!
নরেন হঠাৎ উস্টা খেয়ে উল্টা হয়ে পড়েন,
পায়ের চাপায় চ্যাপ্টা হয়ে দম ফেলতে লড়েন।
বলেন তিনি, চিড়িয়াখানায় আসব নাকো আর,
নাক ডলছি, কান মলছি, শিক্ষা হলো আমার।

কিছু কথা

মাহ্‌ফিয়া আক্তার মিতু
৫০তম ব্যাচ, এলএলবি (অনার্স)
আই.ডি: ১৯১০৫০১০১০৩৬

কিছু কথা না বলাই থাক
থাক না সে কথা অজানা
তোমাকে বলব ভাবি অনেক কথা
হল না তোমার সে কথা জানা
কিছু কথা না বলাই থাক
নাই বা জানলে সেই কথা
কিছু কথা আমার কল্পনায় থাক
যেটা আমার মনের কথা
তোমায় বলব ভাবি অনেক কথা
হয়নি আজও যে কথা বলা
তুমি কি শুনবে আমার মনের কথা
না থাক আমার মনেই থাক লুকানো
আমার সে না বলা কথা

জীবনের শেষে

তানজিনা নাজনীন
৪৯তম ব্যাচ, বি. এ (অনার্স),ইংরেজি
আই.ডি: ১৮৩০১০১০১০১৮

একদিন আমি চলে যাবো সকল কিছু ছেড়ে
ফিরবো নাকো কোনো দিনও আপন কারও হয়ে
কষ্ট নামের হৃদয়টা করবে জ্বালাতন
সুখ নামের জীবনটা পাবে অবসান
কবর নামের জেলখানাতে শুইয়ে দেবে আমায়
ডাকবে আমায় বলবে কথা মনের ইশারায়
আমার মায়ের ভেজা আঁখি বলবে কোথায় পাই
বলবে সবাই কি হবে কেঁদে ও যে বেঁচে নাই
আস্তে আস্তে যখন সবাই ভুলতে শুরু করবে
পড়বে নাকো মনে আমায় ছুড়ে ফেলে দেবে
এই কি তবে ভালবাসা এই কি তবে জীবন
সকল স্মৃতি ভুলে যাবে মরবে সে যখন

Love

Safia Shahrin
50th Batch, MA in English
ID No. 191010102007

Love comes from heaven
Friend means love
Friend means to come near
Love is needed for everybody
Without love life is dull
Love comes in man's life
Emotion is the main cause for love
Love's opposite name is sorrow
Love has affection,
Love has deep respect
Love makes a man perfect.

ছোট্ট খোকন

আবু হোসেন মোঃ ইখলাস
৪৫তম ব্যাচ, বিএসসি ইন ইইই
আই.ডি:১৭২০৩০৩০১০০১

পাঁচ বছরের ছোট্ট খোকন
প্রশ্ন করে কাল,
বাংলাদেশের ঐ পতাকার
মধ্যে কেন লাল।

মা কেঁদে কয় অশ্রু মুছে
ঐ পতাকা গড়তে
অনেক রক্ত ঝরে,
বীর বাঙালির রক্ত দিয়ে
ঐ পতাকা গড়ে।

ছোট্ট খোকন বলে ওঠে
করে নিজ শাসরুদ্ধ,
আমিও বড় হয়ে করবো
দেশের জন্য যুদ্ধ।

মা খোকনকে টেনে নেয়
তার নিজ কোলে,
খোকন আবার বলে ওঠে
আমিও মা রক্ত দেব
দেশের প্রয়োজন হলে।

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত	:	চিকিৎসাসেবাই আমার প্রার্থনা
জসীম মাহমুদ	:	নস্টালজিক
অন্তরা দাশ গুপ্তা	:	আমার কর্মজীবন

চিকিৎসা সেবাই আমার প্রার্থনা

অধ্যাপক ডা. প্রাণগোপাল দত্ত

Doctor শব্দটি reek Docere শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। Docere শব্দের অর্থ হলো Knowledge person বা জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানপাপী নয়। Patient শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে মৌলিক Latin শব্দ Patiere থেকে, যার অর্থ হলো Who seeks help অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী বা চিকিৎসাপ্রার্থী। জ্ঞানী ব্যক্তি তারাই, যারা তার জ্ঞান সমাজের কল্যাণে বিলিয়ে দেন। বিনিময়ে কিছু নেন না। যেমন-স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং গ্রিক শব্দের আক্ষরিক অর্থে ডাক্তাররা। আমি যখন ছাত্র তখনো শিক্ষকরা এমনটাই ছিলেন। অকাতরে জ্ঞান বিলানো এবং ক্লাসের কিছু ছেলেকে আদর-যত্ন- ভালোবাসা-শাসন সবকিছু দিয়ে কীভাবে মানুষ করা যায়, সেটা ছিল তাদের মুল ব্রত। কোনো ধর্ম বা শিক্ষা যেমন মানুষকে অমানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয় না, তেমনি কোনো ধর্মগুরু বা সুফি-সাধক কাউকে অসৎপথে যাওয়ার উপদেশ দেন না। কোনো শিক্ষাই মানুষকে অমানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয় না। যে কোনো শিক্ষক তার সন্তানের চেয়ে ছাত্রকে ভালোবাসেন। ব্যতিক্রম, অনেক ব্যতিক্রম হলো চিকিৎসা শিক্ষা। যে শিক্ষার যাত্রা শুরুর প্রথম ক্লাসে ছাত্রকে শপথ নিতে হয় এবং সেই শপথের বাণী গ্রিক ডাক্তার এবং দার্শনিক Hippocrates-এর, যে শপথের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য একজন ডাক্তারকে অনুসরণ করতে হয়। তারপর চিকিৎসকের জীবনে আরও আদর্শিক ও নান্দনিক Declaration পালনের অঙ্গীকার। সেটা হলো-বেহবাধ Declaration, হিপোক্রেটস শপথ বা জেনেভা অঙ্গীকার দুটোই ডাক্তাররা জানেন। 'জানা' আর 'হৃদয়ঙ্গম'-এর অনেক পার্থক্য। হৃদয়ঙ্গম হলেই হয়তো ভালো। ছোটবেলা থেকে দেখেছি, গ্রামের কোনো সাধারণ ছেলেমেয়ে এসএসসি পাস করলে তাকে নিয়ে কী করবেন, সেটার জন্য অভিভাবকরা পরামর্শ নিতেন ডাক্তার অথবা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে। কখনো অন্য কোনো পেশার দ্বারস্থ তারা হতেন না এবং ডাক্তার বা হেডমাস্টার সঠিক সিদ্ধান্তই দিতেন। আমার বেলায় এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর আমি যখন ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন আমার শিক্ষক, পরিবারের সদস্য ডাক্তার দাদু অশ্বিনী কুমার দত্তের উপদেশের পরও আমার বাবা আমাদের এক আত্মীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং সমাজের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত প্রয়াত অনঙ্গ মোহন পালের পরামর্শ চাইলেন। তিনি যে পরামর্শটা দিলেন বাস্তবতার নিরিখে সেটা হলো বিএসসি পাস করে এমবিবিএস পড়লে ভালো ডাক্তার হওয়া যায়। তাঁর এই উপদেশের পেছনে যুক্তিও ছিল। তা হলো, কুমিল্লা শহরের তখনকার বিখ্যাত ডাক্তারদের

যেমন-ডা.সুলতান আহমেদ, ডা. মহিউদ্দীন, ডা. পবিত্র মোহন রায় সবাই ছিলেন বিএসসি, এমবিবি এস। যাই হোক, বাবা শেষ পর্যন্ত সেই উপদেশটি গ্রহণ না করে আমাকে হয়তো

বা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। উপমহাদেশে আমাদের প্রজন্মের প্রায় সবাই ডা. বিধান রায়ের নাম জানেন। যুগে যুগে কিছু ব্যক্তি অনন্য প্রতিভা নিয়ে জন্ম নেন। তিনি হয়তো তাদেরই একজন। কোনো ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ MBBS ডাক্তার ৯ মাসের মধ্যে MRCP এবং IRCS দুটো ডিগ্রি করতে

পেরেছেন আমার জানা নেই। কিন্তু বিধান রায় তা-ই করেছিলেন। তার Dissection Kiv Anatomy অংশবিশেষ তিনি ভারতবর্ষে চলে আসার পরও Practical হিসেবে দেখানো হতো। আবার তিনিই একমাত্র ডাক্তার, অনেক সময় রোগীকে দেখে রোগের কথা বলে দিতেন। বলা হয়ে থাকে, মৃত্যুর দিনক্ষণও তিনি অনেক রোগীকে বলে দিতে পারতেন। বলাবাহুল্য, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের সল্টলেক সিটির নাকি তিনিই রূপকার এবং স্বপ্নদ্রষ্টা। চিকিৎসক, উপাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কখনওই রোগী দেখা বন্ধ করেননি অর্থাৎ জনগণের সেবাই ছিল তার একমাত্র ব্রত। জ্ঞানী ব্যক্তির (অর্থাৎ চিকিৎসক, শিক্ষ" যদি জ্ঞান বিলানো অন্যতম স্বপ্ন হয়, তা হলে অর্থ উপার্জন হওয়া উচিত গৌণ। ডাক্তারদের অনেক সুবিধা আছে, যা অন্য পেশার মানুষের নেই। তার অন্যতম হলো-কোনো ধরাবাঁধা অবসর নেই। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিলেও পেশাগত জীবন থেকে অনেক সময়ই অবসর মেলে না। অর্থাৎ তাদের সৎপথে রুজি-রোজগার একটা চলমান প্রক্রিয়া। তবে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেবা দেওয়া। মনে রাখা উচিত, ডাক্তারি একটা সৎ পেশা-এটা কোন ব্যবসা নয়। বিনা পয়সায় একজন রোগীকে দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ পরামর্শটা কারও কাছ থেকে কিনে এনে বিক্রি করতে হয়নি। কেউ সম্মানী না দিলে মোটেই আর্থিক ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়টা হলো-রোগীর কাছ থেকে অগাধ ভালোবাসা, সম্মান ও দোয়া পাওয়া যায়। অনেক সময় রোগীরা এসে বলেন, ডাক্তার সাহেব ওপরে আল্লাহ নিচে আপনি। কাউকে কখনো বলতে শুনিনি মাঝে কোনো দেব-দেবতার করুণার ওপর নির্ভরশীল। ডাক্তার বা ভালো চিকিৎসক হওয়ার বিড়ম্বনাও আছে। যেমন-কোনো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে খেতে বসেছেন, পাশের চেয়ারে বসা অতিথি যখন জানল আপনি একজন চিকিৎসক, তখন সে পকেট থেকে বের করে একটি প্রেসক্রিপশন আপনার সামনে ধরে বলবেন, দেখুন তো ডাক্তার সাহেব ওষুধটি ঠিক আছে কিনা? কিছু রোগী আছেন, যারা চিকিৎসকের বিনয়কে অত্যন্ত কলুষভাবে মূল্যায়ন করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার পেশাগত জীবনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি-১. আমি তখন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডা. নুরুল আমিন স্যারের স্নেহভাজন হিসেবে আমার প্রাকটিস বেশ চলছে, একদিন রাত সাড়ে ৮ টায় আমি Chamber বন্ধ করে বাসায় যাব, এমন সময় দেখলাম, একটা বাচ্চাকে নিয়ে দুটো রিকশায় করে কয়েকজন লোক আমার Chamber এর সামনে নামলেন। বাচ্চাটা কানের ব্যথায় চিৎকার করছে। আমি আবার চারটা তালা খুলে রোগীকে দেখে দিলাম। আমি হেঁটে বাসায় যাচ্ছি, তখন এরাই রিকশা করে যাচ্ছেন। রোগীর আত্মীয়স্বজনদের একজন আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আরে, যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, একশ টাকার লোভ কি ছাড়তে পারে।' মনে খুব কষ্ট পেলাম। এত কষ্ট

পেলাম যে, কয়েক দিন আহার-নিদ্রা তো ছিলই না, কোনো কাজে মনোনিবেশও করতে পারিনি। কারণ আমি কখনো রোগীর কাছ থেকে চেয়ে ফি বা সম্মানী নিইনি বা নিতে পারিনি; ভবিষ্যতেও বোধ হয় পারব না। ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো, সপ্তাহ দুয়েক পরে। একইভাবে Chamber বন্ধ করে বাসায় যাব, তখন একজন রোগী আমাকে দেখাতে এলেন। তেমন জরুরি মনে হলো না। তাই আমি তাকে বললাম, আগামী দিন আসুন। এ কথা বলে আমি হেঁটে স্টাফ কোয়ার্টারের বাসার দিকে যাচ্ছি, ভদ্রলোক রিকশায় যাচ্ছেন তার সঙ্গীসহ। ভদ্রলোক তার সঙ্গীকে বলছেন, 'অনেক পয়সা হয়ে গেছে, তাই একশ টাকার প্রয়োজন নেই।' তবে আজ মনে হচ্ছে, কে কী বলল, সেটা বিবেচ্য নয়, আমার পেশা রোগীর সেবা করা এবং সেটাই হওয়া উচিত প্রার্থনা বা ইবাদত। রোগীর প্রতি চিকিৎসকের যেসব সম্মান থাকা উচিত, ঠিক সে রকম আত্মবিশ্বাস রোগীরও ডাক্তারের প্রতি থাকা দরকার। ডাক্তারকে হতে হবে রোগীর Custodian। সর্বশেষ শিক্ষা এবং চিকিৎসাকে পণ্য হতে দেওয়া যাবে না এবং 'শিক্ষা ও চিকিৎসা যদি পণ্য হয়ে যায়, তবে তার গুণগত মান থাকে না'। বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে তাই হচ্ছে। সর্বশেষ মনে রাখতে হবে, ডাক্তার হলেন পূজারি, রোগী দেবতা এবং হাসপাতাল হলো ডাক্তারদের মন্দির।

নস্টালজিক

জসীম মাহমুদ
সহকারী পরিচালক (অডিট)

আক্ষরিক অর্থেই আমরা এই পৃথিবীর সবচাইতে ভাগ্যবান জেনারেশন। আশির মাঝামাঝি থেকে দুই হাজার সাল অব্দি আমরা যারা শৈশব-কৈশোর কাটিয়েছি এই বাংলাদেশে তারা কী পাইনি 'তিন গোয়েন্দা' আর 'দীপু নাম্বার টু' পড়া দিয়ে শুরু। কিশোর মুসা রবিন আর জীনার সাথে আমাদের কী ভীষণ বন্ধুত্ব! তারপর একটু বড় হতেই মাসুদ রানার রোমাঞ্চকর জগতে প্রবেশ। সাথে এক হাতে বাংলা সাহিত্য এবং নাট্যজগৎ অন্যরকম ভালোলাগায় গড়ে দেয়া সেই মানুষটা। হিমু, মিসির আলী, শুভ্র, জহির, মুহিব, অপলা, জরী, তিলু, নীলু থেকে শুরু করে বাকের ভাই, মজিদ, টুনি, তিতলী- কঙ্কা, চৌধুরি খালেকুজ্জামান, চ্যালেঞ্জার, ফারুক, ডাক্তার এজাজ, রিয়াজ, স্বাধীন খসরু, সূবর্ণা মুস্তফা, হুমায়ূন ফরিদী, শাওন। আমরা সবকিছু পড়েছি, দেখেছি, হেসেছি, কেঁদেছি, ভালোবেসেছি। দিয়েগো মারাদোনার শেষটা দেখতে না দেখতেই প্রবেশ করেছি রোনালদো, রোনালদিনহো, জিদানের মানবীয় জগতে। বছরের পর বছর ধরে কী দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা, হাজার অর্জন, সবকিছু ছাড়িয়ে যাওয়া ম্যাজিক আর মুগ্ধতা। রাতদিন কত আলোচনা সমালোচনা ঝগড়া আর তর্ক।

শচিন টেন্ডুলকারের শ্রেষ্ঠ সময় দেখেছি, শেষটা দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ার অপ্রতিরোধ্য টিমের খেলা দেখেছি। লারা, ম্যাকগ্রা, মুরালীকে দেখেছি। দেখেছি আকরাম খানকে বাংলাদেশকে ওয়ানডে স্টাটাস পাইয়ে দিতে। প্রবেশ করেছি সাকিব-তামিম-মাশরাফির যুগে। একটা নড়বড়ে দলকে চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেখছি। আমি নিশ্চিতকরে বলতে পারি কোনো একদিন বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জিতে নিলেও আজকের এই জয়ের তীব্র আবেগটা থাকবে না। আমাদের সময়েই তো শুরুটা হয়েছে। জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, বেজবাবা, আর্টসেল, শিরোনামহীন, মাইলসের সবচাইতে সুন্দর সময়ের সাক্ষী আমরা। একের পর এক দূর্দান্ত গানে ভেসে যাওয়া জেনারেশন আমরা।

শাহরুখ-সালমান-আমিরের সময়ের মানুষ আমরা। আমাদের সময়ে সিনেমা বানিয়েছে ক্রিস্টোফার নোলান নামের একজন মানুষ। আমরা সিনেমা শেষ করে তন্দা খেয়ে বসে থাকছি। শৈশবের সব সুপার হিরো নিয়ে পর্দায় এসেছে জাস্টিস লীগ আর এভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়্যার।

আমরা কী ভীষণ ভাগ্যবান একটা জেনারেশন। আমাদের গর্ব করার কত কিছু আছে। নস্টালজিক হওয়ার কত স্মৃতি আছে। আবেগে ভেসে যাওয়া কত মুহূর্ত আছে। মুগ্ধতায় ডুবে যাওয়া কত সৃষ্টি আছে। মায়ের হাতের সুস্বাদু খাবার খাওয়া শেষ জেনারেশন বোধহয় আমরা। বাবাকে জমের মত ভয় পাওয়া শেষ জেনারেশনও সম্ভবত আমরাই। নাম না জানা

অসংখ্য সুস্বাদু পিঠেপুলি আর কতটা শীতের সকালে খাওয়া হবে কে জানে!

টিভিতে আলিফ লাইলা, সিন্দাবাদ, রবিনহুড, গডজিলা শুরুর মিউজিক বাজলে আমাদের বুকের রক্ত যেভাবে ছলকে উঠতো, সেই তীব্র আনন্দ আজকের নারুটো আর ড্রাগন বল জি দেখা বাচ্চারা কোনোদিনও বুঝবে না।

শুক্রবার নামের আবেগটা শেষ আমরাই বোধহয় অনুভব করেছি।

আমরা যেমন ভাগ্যবান, সাথে সাথে আমাদের দুর্ভাগ্যও কি কম? ভাবতে গেলে আর ভাবনা চালিয়ে যাওয়া যায় না। তিন গোয়েন্দা তো শেষ হয়েই গেছে একরকম, মাসুদ রানা এখন কে লেখে তার ঠিক নেই। সেই স্বাদ পাওয়া যায় না। কাজীদা নব্বই বছর পার করে ফেলেছে, আর কদ্দিন? হুমায়ূন আহমেদ চলে গেছেন। সব বই পড়া শেষ, সব নাটক দেখা শেষ। ভাবতে গেলে কেমন লাগে! প্রথম আলোর সাথে সোমবারে আলপিন দেয় না। বৃষ্টি হলে কাগজের নৌকা ভাসাই না বহুকাল।

কতগুলো ব্যান্ড ভেঙে গেছে। নতুন গান আসবে না। নতুন এলবাম আসবে না। আইয়ুব বাচ্চু মারা গেল। বেজবাবা অসুস্থ। জেমসের বয়সও তো কম হয়নি। মাইকেল জ্যাকসান মারা গেছে বহুদিন। চেস্টার বেনিংটন সুইসাইড করলো চোখের সামনে। নতুন ফানি ভিডিও বানাবে না আর মিস্টার বিন। হিথ লেজারকে আর কোনোদিন জোকার চরিত্রে দেখা যাবে না। শাহরুখ, সালমান, আমির বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। শৈশবের হিরোরা এখন ফানি লাগে। অসুস্থ কন্টেন্টে ভরপুর ফেসবুক আর চালাতে ভালো লাগে না। আব্বু তো আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মারা গেলেন। আম্মুর বয়স হয়ে যাচ্ছে। ভাই-বোন যার যার মত থাকে। একসাথে হাসি আনন্দ অথবা মারামারি হয় না।

আর অল্প কয়টা বছর। তারপর কোনোদিন ফুটবল মাঠে পায়ের ছোঁয়া পড়বে না মেসি-রোনালদোর। এই দুই অতিমানবের পায়ে সৃষ্টি হবেনা কোনো জাদুকরী মুহূর্ত। আর একটা বিশ্বকাপ। তারপর সাকিব, তামিম, মাশরাফিও কি বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামবে? ভাঙা পা নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে কেউ আর পড়ে যাবে না, ভাঙা আঙুল নিয়ে কেউ দশ ওভার বল করবে না, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে কেউ ব্যাটিংয়ে নেমে যাবে না। লিখতে গিয়ে এই মুহূর্তে আমার চোখে পানি চলে আসছে। পারফেক্ট মুশফিকের সাথে বিপদের বন্ধু মাহমুদুল্লাহ। এই পাঁচজন ছাড়া বাংলাদেশ মাঠে নেমেছে সেটা আমরা কিভাবে সহ্য করবো কীভাবে?

আর কয়েক বছর পর মানুষ অনেক আধুনিক হবে। আধুনিক সমাজ প্রেমের ব্যাপারে অনেক উদার হবে। আমরাই শেষ জেনারেশন যাদের প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডারের সাথে। একটা মানুষকে ভালোবেসেও শুধুমাত্র সমাজের কারণে একসাথে জীবন কাটানো হয়নি আমাদের অনেক বন্ধুদের।

যদি বেঁচে থাকি হাজার হাজার স্মৃতি নিয়ে বুড়ো হয়ে যাবো। ভালো লাগা আর খারাপ লাগা দুই ধরনের স্মৃতির ওজনে ভারী হয়ে থাকবে আমাদের বয়সের বোঝা। কোনো এক ক্লান্ত সন্ধ্যার আলো আঁধারীতে বেলকনির বেতের চেয়ারে বসে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবব, 'জীবনটা আসলে খারাপ ছিলো না'!

আমার কর্মজীবন: সংগীত শিক্ষক

অন্তরা দাশ গুপ্তা
৪৯ তম ব্যাচ, বিএড
আই.ডি: ১৮৩০১০৩০১০৩৩

২০১৮ সালের ১১ই এপ্রিল আমার জীবনের অত্যন্ত স্মরণীয় দিন। সেদিন আমি প্রথম "কসমো স্কুল" এ সংগীত শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হই। আমার জীবনের প্রথম চাকুরী তাই অনেক ভয়, জড়তা, কিছুটা দুশ্চিন্তা সহ স্কুলে যাই। কিন্তু সেদিন সৌভাগ্যক্রমে কোন ক্লাস নিতে হয় নি। শুধু শিক্ষার্থীদের সংগীতের পরীক্ষা নিতে হয়েছিল। কারণ তখন স্কুলের ১ম সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। আর আমার ক্লাসগুলো ছিল প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে তাই এত ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখে আমার আনন্দ ও ভয় দু'টিই হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল আমি কিভাবে এদেরকে সংগীত শিক্ষা দিব। পরীক্ষা নেওয়া শেষে সহকর্মীদের সাথে পরিচয় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে আমি আমার ক্লাস ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষকরা কিভাবে ক্লাস নিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করি। শিক্ষার্থীদের কীভাবে ক্লাস নেয়া হলে তাদের ক্লাসটি আরও আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই দিকগুলো খেয়াল করি। এছাড়াও স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং সেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করি যা অনেক সাহায্য করে। এভাবে ক্লাসগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং আমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে আমি তাদের ক্লাসগুলো নিতে থাকি। কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের সাথে আমার খুব ভাল একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়।

যদিও আমি সংগীত শিক্ষক কিন্তু আমার লক্ষ্য থাকে যে, সংগীতের মাধ্যমেও যাতে তাদের নৈতিক ও বাস্তব জীবনধর্মী শিক্ষা দেওয়া যায়। এভাবে প্রায় কয়েকমাস যাওয়ার পর আমার ক্লাসে আমি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করি যে, তোমরা বড় হয়ে কি হতে চাও? তখন তাদের একেকজন বলল যে, তারা ডাক্তার, পাইলট ইত্যাদি হতে চায়। কিন্তু কয়েকজন শিক্ষার্থী বলল যে, টিচার, আমি বড় হয়ে আপনার মত মিউজিক টিচার হতে চাই। এটি আমার জীবনের সব থেকে বড় পাওয়া। আরও একটি বিষয় হল যে, তারা আমার সঙ্গীত ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করে- কখন ক্লাস হবে। কিছুদিন আগে অসুস্থতার জন্য প্রায় বেশ কয়েকদিন স্কুলে আসা হয় নি। পরে স্কুলে আসার পর শিক্ষার্থীরা আমাকে কতটা মনে করেছে তা দেখে আমার এত ভাল লেগেছে তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। পরিশেষে এটিই বলব যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এমন হওয়া উচিৎ যেন তারা একে অপরের পরিপূরক হয় এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য শিক্ষক সর্বদা যেন সচেষ্ট থাকেন। একজন সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে আমি শিক্ষার্থীদের সাথে যে কাজগুলো করে থাকি, তা হলোঃ

- প্রথমত, বাচ্চাদের গানগুলো শুধু গেয়েই নয় সাথে সেগুলোর অ্যাকশন গুলো কতটা মজার করে করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য যারা ভাল করছে তাদের স্টিকার দেয়া, হাত তালি দেয়া এসব দিকে খেয়াল রাখা।
- যেসব শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো মুখস্ত করতে চায়না যেমন, ছোট বাচ্চারা অ,ই,ঈ/ক,খ,গ/১,২,৩ এসব বিষয়গুলো গানের মাধ্যমে শেখানো।
- ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় তাদের খেলার জন্য রাখা। যেমন, কে কত তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে পড়ার একটা বিষয় বলতে পারে।
- আবার যেসব শিক্ষার্থীরা কম পারছে তাদের ডেকে এনে সেই বিষয়টি সহজ করে তাদের ধারনক্ষমতা অনুযায়ী শেখানো।

রম্য-রচনা

মোঃ কামরুল হাসান : কৌতুক

কৌতুক

মো. কামরুল হাসান
৪৯ তম ব্যাচ, এমএ, ইংরেজি
আই.ডি: ১৮৩০১০১০২০০৪

১। দুই বন্ধু পথে দেখা হল, উভয়েরই শ্রবণশক্তি কিছুটা কম ।
১ম বন্ধুঃ বাজারে যাচ্ছ?
২য় বন্ধুঃ না বাজারে যাচ্ছি।
১ম বন্ধুঃ ও ওহ আমি ভাবলাম তুমি বাজারে যাচ্ছো ।

২। এক হতদরিদ্র ব্যক্তির পেট ব্যাথা উঠলে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন । ডাক্তার তার শরীর পরীক্ষা করে বলেন-
ডাক্তারঃ আপনার পায়খানা কেমন?
তখন রোগী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, স্যার গরীবের আবার পায়খানা । ছালা দিয়া কোনরকম বানাইয়া রাখছি আর কি।

৩। পুলিশের এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হল-
ইদানিং ডগ স্কোয়াডের কার্যক্রম সেরকম চোখে পড়ছে না কেন?
পুলিশ বিরক্ত হয়ে বললেন, খুব ঝামেলা করে, কুকুর চোর খুঁজতে খুঁজতে থানার ভিতরেই ঢুকে পড়ে।

৪। বিমানের এক যাত্রী বিমানের টয়লেটে গিয়ে দেখেন কমোডে একটি সাপ। তখন তিনি আতংকিত হয়ে বিমানবালাকে বলেন, দেখুন টয়লেটে সাপ ।
তখন বিমানবালা বললেন প্রথমে সাপ ঢুকেছে, সাপের টয়লেট হবে, তারপর আপনি যাবেন, সিম্পল ।

৫। এক ব্যক্তি খুব লাজুক স্বভাবের, এমন লাজুক যে তার শ্বশুরের সাথেও কথা বলেন না। এতে তার শশুর বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করলেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যেভাবেই হোক

শ্বশুরের সাথে কথা বলবেন। এরপর তিনি গ্রামে গিয়ে দেখেন শ্বশুর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাঁশঝাড়ের নিচে বসে আছেন, তখন জামাই-

জামাইঃ আসসালামু আলাইকুম আব্বাজান, কেমন আছেন?
শ্বশুর তখন লজ্জায় মুখ লুকানোর চেষ্টা করছেন ।
জামাইঃ আমি নাকি কথা বলতে পারি না এখন কেন মুখ লুকান?

৬। এক ব্যক্তির গরু হারিয়েছে। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও গরুটি পেলেন না। এরপর ঘরে ফিরে আসলেন। ঘরে তার স্ত্রী ও পুত্র বসে আছে। তখন তিনি তার পুত্রকে বললেন," এক গ্লাস পানি দেন তো ভাই " । তখন তার স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে বললেন," আপ্নের কি হইছে, নিজের ছেলেরে ভাই কইতেসেন ?" তখন ঐ ব্যক্তি বিষণ্ন চিত্তে বললেন," গরু হারাইলে এমনই হয়গো মা "

৭। চাপাবাজ ২ বন্ধু-

১ম বন্ধুঃ আমার নানার এতো বড় গোয়াল ঘর ছিল যে এক পাশ দিয়ে বাছুর প্রবেশ করলে অন্য পাশ দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক গরু হয়ে বের হয়ে আসতো ।

২য় বন্ধুঃ আমার নানার একটি বাঁশঝাড় ছিল যার এক একটি বাঁশ এতো লম্বা হতো যে যখন ঝড় বৃষ্টি হত তখন ওই বাঁশ দিয়ে মেঘ সরিয়ে দিতাম ।

২য় বন্ধু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল এতো বড় বাঁশ কোথায় রাখতি? তখন প্রথম বন্ধু হেসে বলল কেনরে তোর নানার গোয়াল ঘরে ।

ভ্রমণ কাহিনী

মোঃ আব্দুল বাতেন : ভ্রমণ অভিজ্ঞতা: কলকাতা থেকে দার্জিলিং

ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ঃ কলকাতা থেকে দার্জিলিং

মোঃ আব্দুল বাতেন
৫০ তম ব্যাচ, এমএড
আইডি নং- ১৯১০১০৩০২০৩১

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার পাশাপাশি শিক্ষা সফর হিসাবে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করা খুবই প্রয়োজন। তাই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

২০১৮ সাল, ১২ নভেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকা থেকে হানিফ পরিবহনের বাসে রওনা হলাম বেনাপোলের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার পূর্বেই পৌছি কাস্টমস হাউজে। আর দেরি না করে কাস্টমস এর কাজ সেরে পৌছালাম ভারতের হরিদাসপুর বর্ডারে। সেখান থেকে ৫ ঘন্টায় টেক্সিতে করে পৌছালাম কলকাতায়। রাত্রি যাপন করে হোটেল থেকে ভোর ৫টায় বের হলাম কলকাতার দর্শনীয় স্থান দেখতে। প্রথমেই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্ক, হর্সরেস ফিল্ড, সল্ট লেক, কফি হাউস এবং সবশেষে কলকাতা ইডেন গার্ডেন ক্রিকেট মাঠ। বলে রাখা ভাল অধিকাংশ স্থানে যেতে ১০ রুপি থেকে ১০০ রুপি পর্যন্ত টিকেট লাগবে। তিন দিনের কলকাতা সফরের শেষ দিন ৪-৫ ঘন্টার রাস্তা কালীব্রিজ পার হয়ে বর্ধমান জেলা হয়ে বীরভূম জেলা দিয়ে পৌছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতনে, যেখানে আমাদের দেশের অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে।

১৬ নভেম্বর কলকাতার শিয়ালদহ রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৩২ ঘন্টার ট্রেন জার্নি করে পৌছি দিল্লী। এখানে বলা যায় যে, শিয়ালদহ রেল স্টেশন এতই বড় যে, নির্ধারিত প্লাটফর্ম খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য। দিল্লী পৌছে বেরিয়ে পড়লাম দর্শনীয় স্থান দেখতে। প্রথমেই বিখ্যাত দিল্লীর লাল কেল্লা, লোটাস টেম্পল, দিল্লী জামে মসজিদ ও সবশেষে কুতুব মিনার। দিল্লী ঘুরতে ২ দিন হাতে সময় রাখতে হবে। তারপর আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা, যেখানে সম্রাট শাহজাহান গড়েছেন প্রেমের অমর কীর্তি ভালোবাসার অপূর্ব নিদর্শন তাজমহল। যমুনার তীরে এ তাজমহল চোখে না দেখলে তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

অনিন্দ্য সৌন্দর্যের আধার মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়াবার স্থান দার্জিলিং। দিল্লি থেকে ৩১ ঘন্টার ট্রেন জার্নি করে পৌছালাম দার্জিলিং। যা ভূমি থেকে সাড়ে আট হাজার ফুট উপরে। আপন

াকে পৌঁছে দেবে মেঘের রাজ্যে। যেখানে রয়েছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। শিলিগুড়ি থেকে বিশেষ গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছাতে হয়। পথিমধ্যে উপভোগ করতে পারা যায় মেঘের ভেলা যাতে আপনার গাড়ির গ্লাস ভিজে যাবে। মাঝে মধ্যে আপনি শংকিত হবেন ভয়ংকর বিপদজনক রাস্তার মোড়, যা আপনাকে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। দার্জিলিং এর বিখ্যাত স্থান হল টাইগার হিল, যে স্থান থেকে হিমালয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। মনে জাগবে এক অপূর্ব শিহরণ। বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২-৩ বার গিয়েও এ দৃশ্য উপভোগ করতে পারেননি। কারণ কুয়াশায় সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাই দার্জিলিং যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে ৩/৪দিন হাতে সময় নিয়ে যেতে হবে। দার্জিলিংয়ে মেঘে ভাসতে চাইলে যেতে হবে জুলাইয়ে। তবে মজার সময় হচ্ছে মার্চ থেকে জুলাই এবং অক্টোবর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত। তাই সুযোগ করে যে কেউ ঘুরে আসতে পারেন ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলো।

সচেতনতামূলক রচনা

মোঃ শামসুল আকরাম (সুমন : ফিশিং : সাইবার নিরাপত্তা

ফিশিং : সাইবার নিরাপত্তা

মোঃ শামসুল আকরাম (সুমন)
৪২ তম ব্যাচ, সিএসই
আই ডি: ১৬২০৩০১০১০০৫

ইন্টারনেটে ফিশিং (ইংরেজিতে Phishing) বলতে প্রতারণার মাধ্যমে কারো কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন ব্যবহারকারী নাম ও পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য - ইত্যাদি সংগ্রহ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। প্রতারকেরা এই পদ্ধতিতে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ওয়েবসাইট সেজে মানুষের কাছ থেকে তথ্য চুরি করে থাকে। ইমেইল ও ইন্সট্যান্ট মেসেজের মাধ্যমে সাধারণত ফিশিং করা হয়ে থাকে। প্রতারকেরা তাদের শিকারকে কোনোভাবে ধোঁকা দিয়ে তাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। ঐ ওয়েবসাইটটি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর ইমেইল, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডের আসল ওয়েবসাইটের চেহারা নকল করে থাকে। ব্যবহারকারীরা সেটাকে আসল সাইট ভেবে নিজের তথ্য প্রদান করলে সেই তথ্য প্রতারকদের হাতে চলে যায়। ফিশিং হলো সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামক প্রতারণা কৌশলের একটি উদাহরণ। ফিশিং

প্রতিরোধের জন্য এখন আইন প্রণয়ন, ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি, এবং কারিগরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে।

ফিশিং এর পদ্ধতি প্রথম বর্ননা করা হয় ১৯৮৭ সালে। ফিশিং (Phishing) শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৯৬ সালে। ইংরেজি fishing বা মাছ ধরা শব্দটির অপভ্রংশ হিসাবে এর উদ্ভব হয়েছে। সম্ভবতঃ ফ্রিকিং (phreaking) এর অনুকরণে এই শব্দের প্রচলন হয়েছে। মাছ ধরার সময় যেমন টোপ ফেলে মাছদের ধোঁকা দেয়া হয়, সেরকম এই পদ্ধতিতেও ব্যবহারকারীদের ধোঁকা দিয়ে তথ্য বের করে নেয়া হয়।

ফিশিং এর বিভিন্ন ধরন সমূহ

মানসিক ধোকা কিছু কিছু মেইল এসে থাকে যেখানে লেখা থাকে "to restore access to your bank account ...".সাধারণ ভাবেই মানুষ এই ধরনের লিঙ্কগুলোতে গিয়ে ক্লিক করে থাকেন।

লিঙ্ক পরিবর্তন

সাধারণত তারা ওয়েবসাইটগুলোর লিঙ্কগুলোকে সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবহার করে থাকে। যা সাধারণ চোখে আমরা ধরতে পারি না। যেমন ধরতে পারি 'www.facebook.com' যদি তারা এই লিঙ্কটাকে সামান্য পরিবর্তন করে লিখে ফেলেন 'www.faceboook.com' বা 'www.facebok.com' তাহলে সাধারণ ভাবেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে যাবেন।

ফোন ফিশিং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু কিছু কোম্পানি থেকে নাকি ফোন আসে যে তারা সে কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারী তারা তার একাউন্টটা যাচাই করার জন্যে একাউন্ট নাম্বার সাথে তার পিন নাম্বার (এটিএম) চেয়ে থাকেন। এটাও এক ধরনের আক্রমণ।

ফিশিং এর কারণে ক্ষয়ক্ষতি

২০১১ এর জুলাই থেকে ২০১২ এর জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি দশ লক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক

সাইবার অপরাধের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। তাদের প্রত্যেকের গড়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৯০ ডলার। অপরদিকে সারা বিশ্বে ফিশিং এবং ম্যালওয়্যার এর কারনে প্রায় ১১০ বিলিয়ন ডলার এর ক্ষতি হয়েছে, যার কারনে মাথাপিছু ক্ষতির পরিমাণ প্রায়ে ১৯৭ ডলার। যা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ফাষ্টফুডের পেছনে বাৎসরিক খরচের সমান। এই অর্থের ৪২ ভাগই যাচ্ছে ফ্রড কেস এ।

ফিশিংরোধের উপায়

- ফেসবুকে কারোর প্রোফাইল ভিজিট রিকোয়েস্ট একসেপ্ট না করা।
- সেলিব্রেটি অ্যাড রিকোয়েস্ট গ্রহণ না করা।
- কাস্টমাইজ রিকোয়েস্ট বর্জন করা।
- সার্ভে বা জরীপে অংশগ্রহণ না করা।
- ডার্ক ওয়েব ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। যেমনঃ টর ব্রাউজার।
- ভিপিএন বা নিষিদ্ধ অ্যাপিকেশন ব্যবহারে সচেতন থাকা। যেমনঃ ইউসি ব্রাউজার।
- কোন লিঙ্ক কিংবা মেইল ওপেনের আগে এক্সটেনশন যাচাই করা।
- বিশ্বস্ত ব্রাউজার ব্যবহার করা। যেমনঃ গুগল ক্রোম।
- উন্নতমানের এন্টিভাইরাস ব্যবহার করা।
- সব সময় সচেতনতার সাথে অনলাইন একক্সে করা।

Prime University in International Arena

AKM Saifulla : Participation in the 12th South Asian Universities Festival (SAUFEST-2019)
Shuvodip Das : Participation in 'Bhutan International Education Fair -2019'
Nishat Ara Karim : Participation in 'International Education Fair -2019'

Participation in the 12th South Asian Universities Festival (SAUFEST-2019)

AKM Saifulla
Deputy Registrar

A colourful and memorable cultural fest 'The 12th South Asian Universities Festival (SAUFEST-2019)' was organized by the Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, India from 22 to 26 February, 2019 under the aegis of Association of Indian Universities (AIU), New Delhi. The ten (10) countries of South Asia (Afganishtan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Mauritius, Myanmar, Nepal, Pakistan and Srilanka) participated in this gala international event. The concept of organizing SAUFEST is in line with the active collaboration and mutual assistance among the South Asian countries in the educational, social, economic and cultural heritage.

The 12th SAUFEST-2019 was the cultural and literary events comprising of Light Vocal, Group Song, Classical Dance, Folk Dance, Debate, Elocution, Poster Making, Clay Modeling and Mime.

On behalf of Bangladesh the Prime University Cultural Team participated in the 12th SAUFEST-2019 along with other 20 public and private Universities of Bangladesh. The Bangladeshi team was led by the Ministry of Education and University Grants Commission of Bangladesh. From the Ministry of Education Jinnat Rehana, Deputy Secretary and from the University Grants Commission of Bangladesh Dr. Md. Khaled, Secretary, Md. Kamal Hossain, Director, Mauli Azad, Deputy Director, Md. Mustafejur Rahman and Md. Mohibul Ahsan, both Senior Asst. Director attended the 12th SAUFEST-2019 as delegates with the participants of Bangladesh. Dr. Khaled, Secretary, University Grants Commission of Bangladesh was the team leader.

The participants from Prime University included Kazi Nourin Hafsah, LLB-Hons, Imran Hossain Khan, BBA, Indrajit Das, CSE, Sumaiya Sultana, CSE, Golam Moula Mahi, CSE, Rubaiat Sharmin Misty, BBA and Md Atikur Rahman, CSE. A K M Saifulla, Deputy Registrar, was the leader of the Prime University team.

It was noteworthy that the Prime University team met the Hon'ble Vice Chancellor of the Pandit Ravishankar Shukla University Prof. Dr. Keshari Lal Verma at his office on a special invitation and also visited Kalinga University, Raipur, Chhattisgarh on their invitation.

The 12th SAUFEST-2019 was an excellent opportunity for us to gather experience together with multi-cultural heritage of the South Asian Countries.

Participation in 'Bhutan International Education Fair -2019'

Shuvodip Das
Assistant Professor, Department of EEE

A team from PU participated in a two-day long fair "Bhutan International Education Fair -2019" on 30 March and 31 March 2019 at the Thimphu Changlimithang Stadium Parking. Prime University team was led by the Registrar of the University, M A Jabber and another member of the team was Shuvodip Das, Assistant Professor, Department of EEE. The fair was organized by the Ministry of Education, Department of Adult & Higher Education of Royal Government of Bhutan in collaboration with different Bhutanese Education Consultancy firms. 146 educational institutions from India, Bangladesh, Thailand, Australia, Singapore and Canada participated in the fair. The purpose of organizing such fair was to offer an ideal platform to all the stakeholders involved in higher education sector namely educational institutions, consultancy firms, students, guardians and education ministry through ensuring timely and valuable information on educational programs offered by different universities of various countries along with bringing them together under a single umbrella.

The team of Prime University started for Bhutan on 29 March 2019 at 8:20 am from the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka by Drukair Airlines and landed at the Paro Airport, Bhutan at around 9:05 am. From the Airport the team directly went to the hotel named Shantideva situated in Thimphu, only 3 km far from the program venue.

Education Minister of Royal Government of Bhutan, Mr Jai Bir Rai inaugurated the fair on 30 March 2019 and visited the stalls and shared his greetings with the participating educational institutions. Secretary of the Ministry of Education, Mr Karma Yeshey was also there during the inauguration ceremony. PU team briefed the hon'ble Education Minister about Prime University and its offered programs. Education Minister took an interest in typical university education apart from medical stud

ies in Bangladesh and described Bangladesh as a future destination for Bhutanese students. Afterwards, Bhutanese students were informed about the offered programs, tuition fee structure, features and facilities and particular department of PU and were also showed PU documentary.

Team members distributed leaflets among all visitors and assisted potential applicants to fill up the registration form. On successful completion of the registration, PU team handed over a bag containing leaflet, pen, and note book as a souvenir from Prime University.

PU Delegates with the members of Organizing Committee of Bhutan International Education Fair-2019

The team discussed the scope of signing MoUs on student & teacher exchange programs and joint research program with the representatives of Indian Universities besides visiting different stalls in the fair. Many Indian universities showed great interest on mutual collaboration. Moreover, PU team met some Bhutanese education Consultancy agencies and placement firms offering admission services to Bhutanese students for future tie-ups for student recruitment and collaboration.

After completing the mission, the delegate team of Prime University returned Bangladesh from Bhutan on 1 April 2019 at 8:20 am.

Participation in 'International Education Fair -2019'

Nishat Ara Karim
International Desk

More than 3500 students from Somalia are currently studying in Bangladesh. After Turkey and Malaysia, Somali youth has chosen Bangladesh as their 3rd destination for pursuing higher study. Prime Univetsity has become one of the favourite universities to the international students pursuing higher study here from Somalia, Ghana and Zimbabwe and the university is committed to serving the international students with their best efforts.

On 30 June 2019, Prime Universty received an invitation from Banana Group of Somalia to participate in the International Education Fair -2019 and Leadership and Innovation Summit at Mogadishu, Somalia. A team comprising Shuvodip Das, Assistant Professor, Department of EEE and Nishat Ara Karim, International Desk Officer attended the Education Fair -2019 in Somalia.

The PU team started for Sumalia on 25 July 2019 at 9:20 pm from the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka by Air Arabia airlines and landed at Mogadishu Airport at 10:45 am of Mogadishu time on 26 July 2019.

CEO of Banana Group, Abdullahi Mohammad Hazi Nur received the PU delegates from Mogadishu airport. During 13 days of stay in Somalia's capital, Mogadishu, the team stayed in Marhaba Hotel, Makkah Almukarramah Road, Muqdisho, Banaadir, Somalia.

During the visit, the delegates signed Memorandum of Understanding (MoU) with four universities, namely Mogadishu University, Banadir University, Hormud University and Darul Hiqmah University and one research center, Somali Mentorship Institute (SOSMI) Applied Education. These MoUs highlighted exchange of students, academic staff, joint research and publications, joint conferences, workshop & seminars, joint dual degree program and joint placement activities. Moreover, these MoUs will also mark the beginning of academic cooperation between PU and prominent universities of Somalia.

On 30th July 2019, PU team attended the graduation ceremony of about 250 graduates of 12th grade of Mohamud Harbi Primary and Secondary School where Shuvodip Das, member of PU team delivered his speech congratulating the graduates and addressing the importance of pursuing higher education from abroad.

On 31 July, 4th, 6th and 7th August 2019, PU delegates visited Moasser Primary and Secondary School, Al-Furqan Primary and Secondary School, Dugsiga Hoyga Xamar Primary and Secondary School respectively and met the respected Principals, Vice Principals and Directors of secondary schools and informed 11 & 12th grade students about different features and facilities of PU.

On 1 August and 2 August 2019, PU team participated in a two-day long International Education Fair – 2019 organized by Banana Group and supported by the Ministry of Education, Culture and Higher Education. Along with Prime University, several other local and foreign universities from Malaysia, Sudan, and Kenya participated in the fair.

In the inauguration ceremony, Shuvodip Das, Assistant Professor, Dept. of EEE of PU delivered his speech addressing the importance of higher education, leadership and innovation. After the inauguration session, Somali students who passed Secondary Education Certificate Examination visited the stall of PU. PU team members showed them the University documentary and informed them about the offered programs, tuition fee, features and facilities of PU and particular department. Team members distributed leaflets among all visitors and assisted potential applicants to fill up the registration form.

Hon'ble minister of Labor and Social Affairs of Federal Government of Somalia, Mr Sadik Warfa also visited the stall of PU. Moreover, the team met and discussed with a dynamic youth leader, Bisharo Ali who is a feminist, a writer and a leader of strong personality.

MOU signing ceremony between PU and Mogadishu University, Somalia

Meeting with the Minister of Labor and Social Affairs Ministry, Mr Sadik Hirsi Warfa

A moment of visiting Secondary Schools

Inside the Stall of PU in the International Education Fair-2019, Somalia

On 7 August 2019, delegates from PU met and had a successful meeting with the respected Minister, Labor and Social Affairs Ministry, H.E. Minister Sadik Hirsi Warfa. The Minister promised full support from his Ministry and other wings of the Federal Government of Somalia for PU. Representatives from PU also briefed him about the achievements and contribution of PU. In the concluding session of the meeting, delegates from PU handed over crest to the hon'ble Minister. In the evening, respected Minister arranged a dinner at the honor of the delegates of PU. After the dinner, respected Minister presented the delegates traditional cloths of Somalia. During the dinner, respected Minister of Labor and Social Affairs expected Bangladesh to be the education hub for Somali youth very soon.

On 8 August 2019 delegates from PU started for Hargesia from Mogaidshu by African Express at 11:00 am of local time and arrived in Hargesia at 12:30 pm of local time. After one day's stay in Hargesia, the representatives of PU started their journey for Bangladesh from Hargesia to Sharjah at 6 am on 9 August 2019 and arrived in Dhaka at 8:55 pm of local time.

A three member delegation of Prime University on a courtesy call with the honorable President Mr Md Abdul Hamid

A flower bouquet is being handed over to the Chairman, UGC Professor Dr Kazi Shahidullah by a team from Prime University led by Md Ashraf Ali, Senior Vice Chairman of the Board of Trustees

Prime University paying tribute to the martyrs on the Independence Day and National Day 2019

Photo Gallery

Mir Shahabuddin, Chairman, Board of Trustees along with others on the way to pay tribute to the Language Martyrs on 21.02.2019

A cake is being cut on the occasion of the 99th birth anniversary of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

The freshers' reception program for the students of 51st batch of the University

Photo Gallery

A view during the unveiling of cover of the 3rd issue of the Annual Magazine 'The Ray'

Chairman and Senior Vice Chairman of Board of Trustees along with the keynote speaker, Syed Abul Maksud, guests and others in the seminar on 'সমাজ সংস্কারে আমাদের করণীয়'

Crest is being handed over by the Chairman of Board of Trustees to the keynote speaker Professor Dr S M Hafizur Rahman in the seminar on 'Constructive Roles of a Teacher in the Classroom'

Photo Gallery

Participants of the Annual Cultural Competition 2019 with the Chairman, BOT, Treasurer and Members of the Prime University Cultural Club

A view of the pitha stall during 'Pitha Utshab 2019'

Students in a cheerful mood during the reunion -2019 program organized by Prime University Alumni Association

... a home for rendering prime knowledge

প্রাইম ইউনিভার্সিটি
PRIME UNIVERSITY

114/116, Mazar Road, Mirpur-1, Dhaka-1216, Bangladesh
Phone: 9004895, PABX: 9004957, 8031810, Mobile: 01712-675595, Fax: 9025649
E-Mail: info@primeuniversity.edu.bd Website: www.primeuniversity.edu.bd